ভূতের শহর দেখা
বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

গদা ভূত বলে উঠল, 'তোমার কী লজ্জা-শরম কিচ্ছু নেই হাদা ভাই? মানুষের রূপ ধরবে তা জামা প্যান্ট কোথায় পাবে? আমরা ন্যাংটা হয়ে থাকব নাকি?' ন্যাদা হেসে বলল, 'জামা প্যান্ট লাগবে? কটা লাগবে? দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি।' এই বলে ন্যাদা তুড়ুক করে চড়ুই পাখির রূপ ধরে এক দর্জির দোকানে ঢুকে পড়ল। দর্জির সাথে তখন এক খদ্দের খুব গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিয়েছে। তার একটা জামা নাকি খুব ছোট করে ফেলেছে দর্জি। দর্জি হাউমাউ করে কেঁদে-কেটে মাফ চাচ্ছে কিন্তু খদ্দের কিছুতেই শুনছে না। সে টাকা ফেরত চাচ্ছে। ন্যাদা আর চড়ুই-বেশে বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। সে একটি ছিট রাখার আড়ার ওপর থেকে নিজের ভূত রূপে ফিরে মেঝেতে ঢপাস করে নামল। ঘরের মধ্যে হঠাৎ জাম্বু মূর্তির ভূত দেখে দর্জি তো চোখ কপালে তুলে চিৎপটাং।

এমন মজার মজার গল্প নিয়েই ভূতের শহর দেখা।

প্রচ্ছদ :: নাজমুল আলম মাসুম

ভূতের শহর দেখা

ভূতের শহর দেখা

বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

ভূতের শহর দেখা
বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

প্রকাশকাল বইমেলা ২০১৮
প্রকাশক মো. আবদুল কাদের
বাবুই ২/২সি পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০
স্বত্ব লেখক :: প্রচ্ছদ নাজমুল আলম মাসুম
অলংকরণ : ফারনাজ শাহরীন তমা
পরিবেশক বইবাংলা :: অনলাইন পরিবেশক রকমারি
মূল্য ৳ ১৪০ টাকা
ঘরে বসে বইটি পেতে যোগাযোগ করুন
www.rokomari.com/babui
সেন্টার : ১৬২৯৭ সেলফোন : ০১৫১৯৫২১৯৭১

Bhooter Sohor Dekha By Bablu Bhanja Chowdhury
Published by Md. Abdul Kader
Babui 2/2C Purana Paltan, Dhaka
Cell Phone +88 01715331098 ::
email :: babuiprokash@gmail.com
Price Tk 140 :: $6

ISBN : 978-984-8025-17-8

উৎসর্গ

শেখ সামিউল আলম রাজন

ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না, প্রত্যাশা মনে– ছেড়ে দেবে এবার, কেউ বাঁচাতে আসবে। কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না, সিলেটের কুমারগাঁও-এর একটি ওয়ার্কশপ থেকে ভ্যান চুরির অপবাদে খুঁটির সাথে বেঁধে লোহার রড দিয়ে মারতে মারতে শেষ পর্যন্ত মেরেই ফেলা হলো ১৩ বছরের রাজনকে।

গল্পসূচি

কাঁকড়া ও বক ১০
বাঘের ডিসকভারি ১৬
শিয়ালের অঙ্ক বিচার ২২
কিটিকিটি কিররিট ২৮
বাঘের ভয় ৩২
মিলেমিশে ৩৬
শিয়াল ও কুকুর ৪৩
মোবাইল ৪৭
ভূতের শহর দেখা ৫৪
গজঘট ৬৪
বনবিড়ালের শাস্তি ৭০

কাঁকড়া ও বক

একদিন ভীষণ এক কাণ্ড হয়েছে! পুঁটিমাছ খেতে গিয়ে একটি বক পানিতে ঠোকর দিয়েছে। অমনি পানির মধ্যে একটি কাঁকড়া বকের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। কাঁকড়াটি বড় আর বেশ ভারী, বকের লম্বা-লতানো গলা। ঝটপট করলেও কাঁকড়াসুদ্ধ তুলতে পারছে না।
বক মনে মনে বলল, 'কী জ্বালা! ভাই ছেড়ে দে! আমি বাঁচি!' কাঁকড়া মনে মনে বলল, 'শালা! খেতে এসেছিস! তোর মুখ আজকে ছিঁড়ে নেব!' বকের দুই ঠোঁট একসাথে কামড়ে ধরেছে কাঁকড়া। বক তাই ভালোভাবে কথা বলতে পারছে না। যা বলছে সব নাকে উঠে যাচ্ছে। নাকি সুরে বক বলল, 'এঁ ভাঁই, আঁমিতো তোঁমাকে কিঁছু বঁলিনি!' কাঁকড়া বলল, 'তুই যতই নাকে কাঁদিস, যুত করে যখন ধরেছি, আজ আর ছাড়ছিনে! বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান!' বলেই কাঁকড়া তার করাতের মতো হাত-পা দিয়ে বকের লম্বা ঠোঁটের একেবারে অর্ধেক পর্যন্ত ভালোভাবে জাপটে-কামড়ে ধরে পড়ে থাকল পানির মধ্যে। বকটি বেশ দুর্বল, খাওয়া-দাওয়া ভালো হয় না তো। কিছুক্ষণ জাপটা-জাপটি করে হাঁপিয়ে গেল। বক বাধ্য হয়ে পানির ধারে দাঁড়িয়ে আর কাঁকড়ার কামড়-টানে ঠোঁট পানির মধ্যে ডুবিয়ে আছে। দূর থেকে দেখলে কেউ ভাববে বক ছবির মতো দাঁড়িয়ে পানি খাচ্ছে। বক নাকে তুলে বলল, 'তোঁর পাঁয়ে পঁড়ি,

ছেড়ে দে!' কাঁকড়া বলল, 'শালা! আমার নাম ত্যাঁদড় কাঁকড়া! আমার সাথে জোচ্চুরি!' বকের খুব লাগছে। মুখে খুব জোরে ফুটবল লাগলে কিছুক্ষণ ধরে মনে হয় মুখটা নেই। বকেরও ঠিক তেমন মনে হচ্ছে। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, 'কী কু-ক্ষণে যে পুঁটিমাছ খেতে এসেছিলাম! না হয় আরো দুদিন না খেয়ে থাকতাম! এই দুর্বল শরীরে কী করি এখন!'

এদিকে হয়েছে কী! একটি শিয়াল পুকুরপাড়ের কলার ঝোপে বসে বকটিকে দেখতে পেল। শিয়াল খুশিতে ভাবল, 'বাহ! আজ সূর্য কোনদিক থেকে উঠেছে! একেবারে হাতের কাছেই বক!' শিয়ালটি আস্তে আস্তে ঝোপ থেকে বেরিয়ে বকের ওপর ঝাঁপ দেবে বলে তাক করছে, সেই সময় কাঁকড়াটিকেও দেখতে পেয়েছে, শিয়াল আনন্দে মনে মনে বলল, 'বাহ! আবার একটি কাঁকড়াও আছে! এত খাব কখন!' বক আড়চোখে শিয়ালকে দেখতে পেয়ে ভীষণ ভয় পেল, ভাবল, 'সর্বনাশ! জলে কাঁকড়া ডাঙায় শিয়াল! কে খাবে আমাকে!' ওদিকে কাঁকড়া ভূতের মতো চোখ দুটি কোটর থেকে ঠেলে দিয়ে শিয়ালটিকে দেখতে পেল। বলল, 'শালা! নিজে পারছিস না, শিয়াল ডেকে এনেছিস!' বক ভাবল, 'ডানা থাকতে আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিয়ালের পেটে যেতে হবে!'

এদিকে এক অভুক্ত খেঁকি কুকুর মেচি কুকুরের মারধোর খেয়ে একা একা তিড়িং-বিড়িং করতে করতে আসছিল। খেঁকি দেখল একটি শিয়াল পুকুরের দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। খেঁকি তখনও মেচি কুকুরের মার আর কামড়ের কথা ভুলতে পারছিল না। যতবার ঘেউ করেছে ততবার মেচি কুকুর কানে কামড় দিয়েছে। তাই আর 'ঘেউ ঘেউ' না করে আস্তে আস্তে পেছন দিক থেকে শিয়ালের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। শিয়াল বক ধরায় ব্যস্ত থাকার জন্য খেঁকিকে

দেখতে পায়নি।

কুকুরের গন্ধ পেয়ে শিয়াল ভাবল, 'কী ব্যাপার! সমস্যা বলে মনে হচ্ছে!' শিয়াল এদিক-ওদিক তাকাতেই খেঁকিটিকে দেখতে পেল। আর অমনি ছুটে পালাতে যাচ্ছিল। কিন্তু সেটা করলে কামড় খাবে। এই ভেবে ভয়ে বোকা হয়ে জোর করে হেসে বলল, 'হিঃ হিঃ, পুকুরে মাছ চাষ করেছিলাম তো। বকে মাছ খাচ্ছে কিনা দেখছিলাম।'

শিয়ালের কথা বলার স্পর্ধা দেখে খেঁকি আর সহ্য করতে পারল না, সে জোরে ঘেউ করে বলল, 'ধর! দাঁড়া!' আর অমনি শিয়াল কানে-মুখে-নাকে হাওয়া বাজিয়ে দে দৌড়! শিয়াল দৌড়াচ্ছে আর বলছে, 'বকে মাছ খায় খাকগে।' এদিকে শিয়াল তেড়ে আসছে ভেবে ভয়ে বক যেই উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করল আর অমনি কাঁকড়ার ভারে পানিতে গিয়ে পড়ল। কাঁকড়া তাড়াতাড়ি বলল, 'শালা! আমাকে পানির ওপর নিবি! তোর মতো দুটো বকের সমান ভার আমি!' এদিকে পানির ওপর দাঁড়াতে না পেরে বকটি পাখনা দিয়ে দাপাদাপি করছে আর নাকে নাকে কেঁদে বলছে, 'দঁম আঁটকে যাঁচ্ছে, ছেঁড়ে দেঁ বঁলছি!' কাঁকড়া বলল, 'আবার কুকুর ডেকে এনেছিস! তা আন না! পানির মধ্যে আন না! কুকুর শিয়াল আর তোকে মিলে খিচুড়ি করে খাব। শুনেছি তোর মাংস চিটচিট, তা আমার চিট মাংস ভালো লাগে।'

পানিতে দম-টম আটকে যাচ্ছে দেখে দাপটা-দাপটি ঝাপটা-ঝাপটি করে কোনো গতিকে বক আবার পানির কানায় উঠে দাঁড়িয়েছে। কাঁকড়া বলল, 'শালা! আবার জোর খাটাচ্ছিস!'

বকটি দীর্ঘক্ষণ মুখে কামড় খেয়ে নাকাল হয়ে পড়েছে। সে মনে মনে বলল, 'যদি মুখ খুলে রাখা যেত, তাহলে তা খুলে রেখেই

সে তাড়াতাড়ি বকের ঠোঁট ছেড়ে দিয়ে 'যা ছেড়ে দিলাম, এবার বেজির পেটে যা' বলতে বলতে পুকুরের পানিতে নেমে গেল আর বক দুলতে দুলতে সজনে গাছের ডালে গিয়ে বসল।

শিয়াল আর বেজি তখনও 'আমার মাছ, আমার কাঁকড়া' বলতে বলতে ঝগড়া করতে থাকল।

বাঘের ডিসকভারি

জংলা দীঘির ধারে বনের পশুদের একটা মিটিং বসেছে। সেখানে উপস্থিত আছেন বনরাজ সিংহ। অনুষ্ঠানের ঘোষকের দায়িত্ব পালন করছে শিয়াল। এক এক করে হাতি, খাটাস, কাঠবিড়ালি, বানর সবাই হাজির হলো। কিছুক্ষণ পরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উপস্থিত হলো বাঘ। বাঘ বনের প্রধানমন্ত্রী।

শিয়ালকে দেখেই বাঘ নাক-মুখ সিঁটকে একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করল। তার কারণও আছে। ক'দিন আগে ওই জঙ্গলে ডিসকভারি চ্যানেলের লোকেরা এসেছিল। বাঘ তখন তার দুটো ছেলের দুরন্তপনা দেখছিল একটা ঝরনার ধারে বসে। হঠাৎ শিয়াল সেখানে গিয়ে বলল, 'বাঘ সাহেব, জঙ্গলে ডিসকভারি টেলিভিশন কোম্পানির লোকজন এসেছে। আপনার কোনো বক্তব্য থাকলে সেখানে গিয়ে বলুন। টেলিভিশনে সারা পৃথিবী তা জানতে পারবে।'

বাঘ 'ডিসকভারি' 'টেলিভিশন' এসব কথা কখনো শোনেনি। তবু নরম করে 'হালুম' বলে বলল, 'আমিও যেন একটু একটু শুনেছি, ওরকম কিছু আছে। তা পণ্ডিত মশাই আপনি একটা কাজ করুন, মহামান্য রাজা জনাব সিংহকে এসব বলার দরকার নেই। আমি চাই তার আগে আমাকেই সারা বিশ্ব দেখুক।'

শিয়াল বলল, 'কী যে বলেন মন্ত্রী সাহেব! আপনি শিগগির চলুন,

ওরা হয়তো চলে যেতে পারে!'

এদিকে বাবার এরকম খুশির খবরে বাঘের ছেলে দুটো একে অন্যকে থাবা মেরে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করল। যদিও কিছু পরে সে উল্লাস একজনের কান্নার কারণ হলো। আনন্দের চোটে চোখ-মুখ হাঁ করে পড়ে থাকা অবস্থায় একটি ছেলেকে আরেকটি ছেলে থাবড়িয়ে আদর করতে গেল। তখন নখ হাঁ করা চোখে ঢুকে যায় আর তক্ষুনি সে কেঁদে উঠলে হই-হুল্লোড় বন্ধ হয়ে যায়।

বাঘ মহা আনন্দে চলতে শুরু করল। আর শিয়াল ধিন ধিন করে নাচতে নাচতে তার সাথে চলল। বাঘ আর শিয়াল পণ্ডিত হাঁটতে হাঁটতে একটা ঘন সুন্দরী গাছের জঙ্গলে এসে পড়ল। তারপরেই একটুখানি ফাঁকা জায়গা। শিয়াল বাঘকে বলল, 'মন্ত্রী সাহেব, ওই ফাঁকা জায়গায় ওনারা আছেন। আপনি যান, আমি এখানে বসি।' বাঘ একটু গদগদ হয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি ঠিক কী বলব পণ্ডিত মশাই? না, মানে আমি জানি, তবুও আপনি যদি...ইয়ে... মানে, একটু বলে দিতেন!' শিয়াল বলল, 'দেখুন, কোনো ভয়-লাজ না, সোজা চলে গিয়ে বলবেন, ধন্যবাদ। আমি এই বনের প্রধানমন্ত্রী। আমাকে কিছু বলার সুযোগ করে দেয়ায় আমি খুশি। আমি খুব খুশি।'

শিয়ালের বলে দেয়া কথাগুলো মুখস্ত করতে করতে বাঘ গেল ডিসকভারি চ্যানেলের লোকদের মাঝে। সেখানে খুব ভালো সেজে 'হালুম' করে বললেন, 'ধন্যবাদ! আমি এই বনের প্রধানমন্ত্রী... ।' আচমকা বাঘ দেখে চ্যানেলের লোকগুলো ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে ক্যামেরা-ট্যামেরা ফেলে দিগ্বিদিক ছুটে পালাল। বাঘ অতশত বোঝে না। সে বলে চলল, 'আমি খুশি! সুযোগ করে দেয়ায় আমি খুব খুশি!' এর মধ্যে চ্যানেলের লোকগুলো সার্কাসের রিংমাস্টারের

চাবুকের মতো একটা চাবুক নিয়ে ফিরে এসে বাঘকে ধুমাধুম পিটুনি শুরু করল। বাঘের খুব ব্যথা লাগছে। তবু ভাবল, প্রচার শুরু হয়েছে– সে 'হালুম' করে বলতে লাগল, 'আমি খুশি, খুব খুশি।' আর বাঘ নড়ছে না দেখে সেই বেগে চলতে লাগল চাবুকের চাবকানি। বেধড়ক পিটুনিতে বাঘের যায় যায় অবস্থা। সে ভাবল এমন তো কথা ছিল না। পণ্ডিত মশাই কী তবে এটা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন? না না, প্রতিবাদ করা ঠিক হবে না। যদি টেলিভিশন উল্টে দেয়! এই ভেবে সে বলে চলল, 'আমি খুশি, খুব খুশি,.. প্রধানমন্ত্রী...।' লোকগুলোও 'বাঘটা সরছে না কেন রে!' বলে আরো জোরে জোরে চাবুক মেরে চলল। বাঘ তবু বলে চলেছে, 'আমি খুশি, খুব খুশি..।' এর মধ্যে কেউ একজন গায়ে এক কলসি পানি ঢেলে দিল। তবুও বাঘ সরছে না দেখে চ্যানেলের লোকগুলো ভয়ে গাড়িতে উঠে গেল। আর গাড়ি নিয়ে বাঘের গায়ে দিল গুঁতো। সেই গুঁতো খেয়ে বাঘ মাটিতে পড়ে গেল। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'ওরে বাবা! পা গেল!' পরক্ষণেই মনে করল, 'ছি ছি! আমি প্রধানমন্ত্রী, ক'দিন বাদে রাজা মানে প্রেসিডেন্ট হব। আমি পড়ে গেলে মানায়!' বলেই সেখানে 'আমি প্রধানমন্ত্রী, আমি খুব খুশি' বলতে বলতে উঠতে গিয়ে আর উঠতে পারে না। তার পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। চ্যানেলের লোকগুলো বাঘের মতি-গতি দেখে ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে চলে গেল।

বাঘ সেখানে পড়ে 'ওরে মারে! ওরে বাপরে!' করে কাতরাচ্ছে আর চিচি করে 'পণ্ডিত মশাই' 'পণ্ডিত মশাই' করে ডাকছে। শিয়াল ভয়ে ভয়ে বাঘের কাছে গিয়ে বলল, 'বাহ!, খুব চমৎকার!' বাঘ যন্ত্রণার মধ্যেও একটু হাসার চেষ্টা করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'চোখে ঘোর দেখছি কেন পণ্ডিত মশাই? মারের চোটে কি এমন হয়?'

শিয়াল বলল, 'ও কিছু না মন্ত্রী মহোদয়। প্রচার ব্যবস্থাটা এরকম, একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' বাঘ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা একটা কালো ডালের মতো দিয়ে অত জোরে বাড়ি মারছিল কেন পণ্ডিত মশাই?' শিয়াল বলল, 'ওটা তো ক্যামেরা! ওটা দিয়ে আপনাকে বাড়ি মেরে মেরে আপনার ছবিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল সারা পৃথিবীতে।' বাঘ দম ছেড়ে বলল, 'ওহ..! তা হবে হয়তো,' তা আপনি কখনো ওই ক্যামেরায় ছবি তুলেছেন?' জিজ্ঞেস করল বাঘ। শিয়াল হেসে মাথা নেড়ে হেলে দুলে জানাল, 'না, সে সৌভাগ্য এখনো হয়নি। আমি তো আর প্রধানমন্ত্রী বা রাজা না।' বাঘ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী হওয়া কী অত সোজা!' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'পণ্ডিত মশাই, আমাকে কেমন দেখলেন?' শিয়াল বলল, 'খুব চমৎকার! যখন টেলিভিশন কোম্পানির লোকেরা দশ-বারো জন মিলে একসাথে আপনাকে পিটুনি– থুড়ি, আপনার ছবি তুলছিল তখনো আপনার বক্তব্য কী সুন্দর সাবলীল ছিল!'

বাঘ চিচি করতে করতে বলল, 'আমি চেষ্টা করেছিলাম ভালো কিছু বলতে। তাই ওই ক্যামেরা না কী ডালের যম পিটুনিতেও আমি ঠাণ্ডা থাকার চেষ্টা করেছি।' শিয়াল বলল, 'তা মহোদয়, আরো কিছু কি বলতেন? মানে আর একটু কি বলবেন?' এ কথা শুনে বাঘ একটু চমকে উঠল, বলল, 'অ্যাঁ! না না! আর চারশ বছরের মধ্যে আমি কিছু বলব না, চারশ বছর পরে গিয়ে দেখা যাবে, আপনি একটু পানি আনতে পারেন?'

শিয়াল পানি আনতে গেল, এই ফাঁকে একটা বানর আর একটা বানরের কাছ থেকে ক্যাওড়া চুরি করে তাড়া খেয়ে ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে বাঘকে চিৎ হয়ে পড়ে কাতরাতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'মাননীয় বাঘ সাহেব, কে আপনার এমন অবস্থা

করেছে? আপনি বলুন আমরা বানরকুল তাকে এক্ষুনি আক্রমণ করব!' বাঘের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না, তবু বানরের অতিশয় আনুগত্য দেখে চিচি করে বলল, 'না না, তেমন কিছু নয়, টেলিভিশন সেন্টারে বক্তব্য দিচ্ছিলাম তো! ক্যামেরার বাড়ি খেয়ে এমন অবস্থা হয়েছে।' বানর এদিক-ওদিক একটু তাকিয়ে হেসে বলল, 'মহোদয়, আপনি অতিশয় বোকার মতো কথা বলছেন। কেউ আপনাকে মিথ্যে কথা বলে তামাশা দেখেছে, পশুপাখিদের টেলিভিশন সেন্টার কোথায়? যা আছে তা মানুষের। ওরা কোনো ছাড় দেয় না, আপনাকে ভয় পায়, তাই আপনাকে আঘাত করেছে।'

বানরের কথা বাঘের মনে ভালো লাগল। সে বানরকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক বলছ?'

'একেবারে দু শ পার্সেন্ট ঠিক' বানর বলল। বাঘ তখন রাগে ফুলে হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'অ্যাই শালা শিয়াল পণ্ডিত! একবার কাছে আয় তোর বংশসুদ্ধ গিলে খাব!'

বাঘের সেই চিৎকার শিয়ালের কানে পৌঁছাল, সে ভয়ে আর বাঘের ধারে-কাছে এলো না।

সাড়ে চার দিন ব্যথা-যন্ত্রণায় ভুগল বাঘ। বাসায় গেলে ছেলেরা বাঘকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবা, বাবা টেলিভিশনে বক্তব্য কেমন হলো?' বাঘ রেগেমেগে বলেছিল, 'বেশি ফ্যাচফ্যাচ করিস না তো। যা দু-একটা শিয়াল ধরে খা, আমায় একা থাকতে দে।'

আজ কোনো রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাঘ সাহেব মিটিংয়ে এসেছেন। শিয়ালের সাথে দেখা হলেও কিছু বলতে পারছেন না, লজ্জার ঘটনাটা যদি সবাই জেনে যায়!
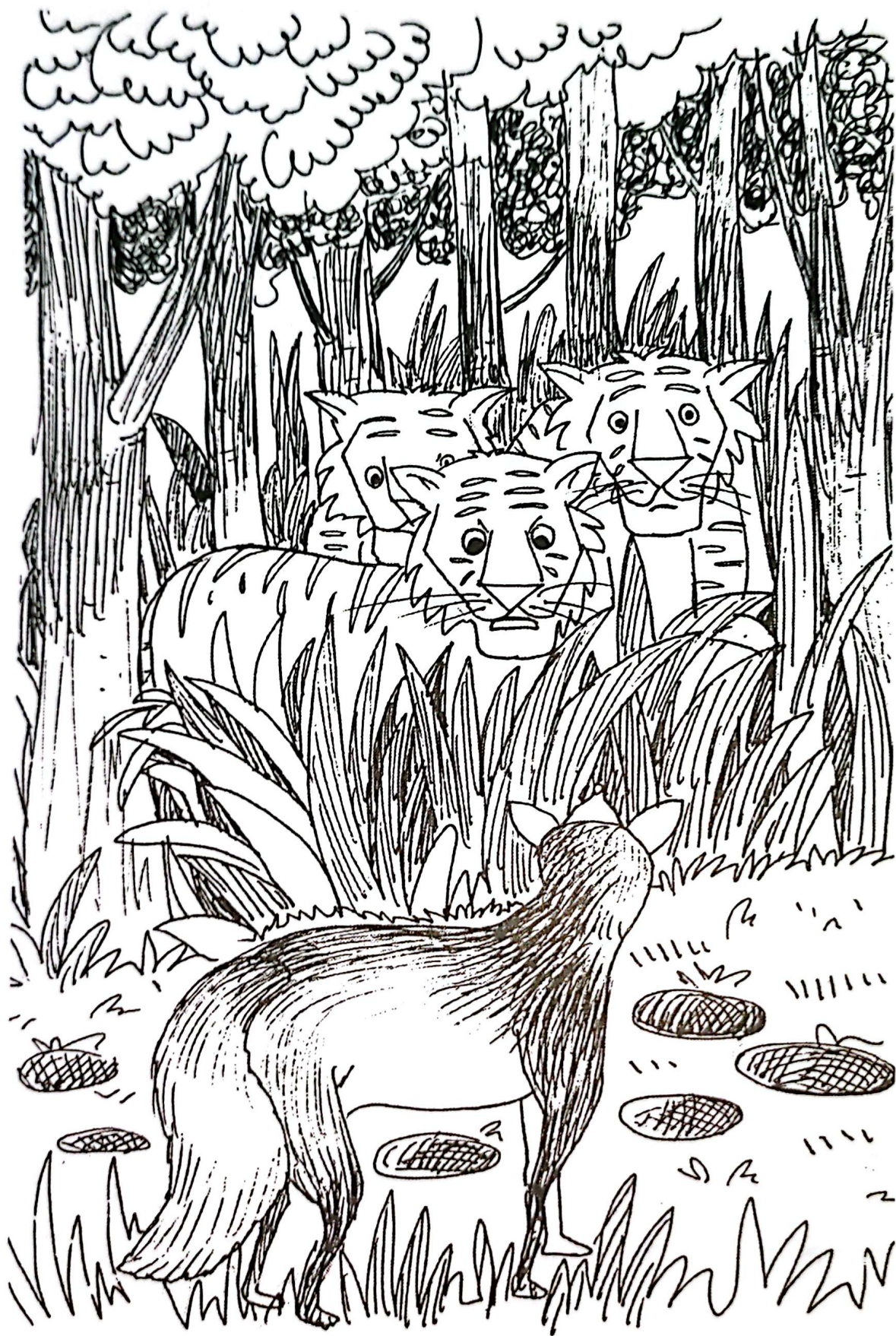
শিয়ালের অঙ্ক বিচার

সুন্দরবন থেকে বেশ দূরে লোকালয়ের পাশে হলদি ক্ষেতে থাকত এক শিয়াল। কিন্তু সে নিজভূমে পরবাসীর মতো। সন্ধ্যেবেলায় মনের সুখে যেই একটু 'হুক্কা হুয়া' হাঁক জুড়েছে আর অমনি দলবেঁধে সব পাড়ার কুকুরের দল তার চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে ছেড়েছে। তাই সে মনের দুঃখে সেই হলদি ক্ষেতের এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে চুপ করে শুয়ে থাকে। আর মনে মনে বলে, 'না! আর গান গাব না! যে আমি শিয়াল পণ্ডিতের বংশধর। সেই আমার এই অবস্থা!' তারপর একটু রাত হলে যখন ঝিঁ ঝি পোকারা গান ধরে তখন বলে, 'না, যে দেশে জ্ঞানীর কদর হয় না, সেই দেশে থেকে লাভ নেই। যাই, সুন্দরবনে যাই। সেখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার থাকে। তারা তো এককালে আমাদের মামা ছিল। দেখি মামার সাথে মজানো যায় কিনা।'

শিয়াল সেই রাতে সুন্দরবনের পথে রওনা দিয়েছে। পথের মধ্যে মুন্সীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে কতগুলো নাখেকো ছুচো কুকুর সারারাত জেগে থাকে। সেই ভয়ে শিয়াল ও পথে না গিয়ে লুকিয়ে পাড়ার ভেতরের পুকুরপাড়। খানিকটা উঠোন, মসজিদের ধার, কচুক্ষেত হয়ে হালুক-ফালুক করতে করতে খোল পেটুয়া নদী পার হয়ে সুন্দরবনে পৌছল।

সুন্দরবনে পৌঁছেই শিয়াল গা-টা ঝেড়ে, হাত-টাত দোলাতে দোলাতে এমনভাবে হাঁটতে লাগল যেন সে একজন নতুন মানুষ। মাস্টারি করতে এসেছে।

বনের ভেতরে একটা হেতাল গাছের ঝোপে তিনটে বাঘ গুটিসুটি মেরে বসে ছিল। শিয়ালকে দেখে একটা বাঘ জিজ্ঞেস করল, 'কে যায়?' আচমকা প্রশ্ন শুনে শিয়াল একটু ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনটে বাঘ ঝোপ থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। বাঘ দেখে শিয়াল একটু গায়ে পড়ে বলল, 'মামা! আমি আপনাদের ভাগ্নে!' বাঘ শিয়ালের সারা শরীর পর্যবেক্ষণ করে বলল, 'শুনলাম আমাদের নামে নাকি ক্রিকেটারদের নাম রাখা হচ্ছে। তা তুমি কিছু জানো?' শিয়াল মনে মনে বলল, 'কী করে জানব মামা, সারাদিন কুকুরের ভয়ে ঘর থেকেই বেরুতে পারি না।' তারপর মুখ ফুটে বলল, 'ওরকম যেন কিছু একটা শুনেছি।' বাঘ হালুম করে বলল, 'হুম, ঠিক আছে, এসো পরিচয় করিয়ে দিই। আমিতো তোমার বড় বাঘ মামা। আমার নাম মাশরাফি, আর ইনি তোমার মেজো বাঘ মামা, এনার নাম হচ্ছে সাকিব। আর উনি তোমার সেজো বাঘ মামা, সেজো বাঘ মামার নাম হচ্ছে গিয়ে– তামিম। তা তুমি আমাদের এসব নাম শুনেছ?'

শিয়াল নাক-মুখ কুঁচকে উত্তর দিল, 'না মামা, তবে আমি পোল্ট্রি মুরগির নাম শুনেছি। এখন তো আর সেসব হেঁটে চলা মুরগি পাওয়া যায় না। কোথাকার সব পোল্ট্রি মুরগি, পাকিস্তানি, কক, সোনালি, অস্ট্রেলিয়ান– তাও আবার সব সময় খাঁচায় থাকে। একদম বাইরে থাকে না। একটা যে ধরে খাব তার উপায় নেই।' এ কথা শুনে বাঘ বলল, 'ওরে! এখানেও সেই একই অবস্থারে! বনদস্যু, জলদস্যু, কাঠচোরদের অত্যাচারে আমরাও অতিষ্ঠ। দেখছিস না, এক

বিটকেল বনদস্যুর ভয়ে আমরা এই হেতাল ঝোপে পালিয়ে আছি। শুনেছি আমরা নাকি বনের রাজা। তা বনের রাজার যদি এই অবস্থা হয় তবে সেটা কী আর বন থাকে? '

শিয়াল বলল, 'মামা, কী দুর্দশায় যে আমি পড়েছি! আগে পুকুরে-বিলে একটু-আধটু কাঁকড়া, চিংড়ি খেতে পারতাম। এখন মানুষেরা সব বড় বড় লাঠি হাতে সারারাত চৌকি দেয়। খেতে গেছ তো মরেছ।'

সব শুনে টুনে বাঘ বলল, 'শোন, তোর দুর্দশা আর আমাদের দুর্দশা একই। হরিণের অভাবে আমরাও না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছি। এভাবে আর কটা দিন চলতে থাকলে আমাদের বিড়াল মনে করে ধরে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে চল আমরা জায়গা পরিবর্তন করি। দূরে নতুন একটা চর জেগেছে। সেখানে হরিণ-টরিন, পশুপাখি, মাছ-কাঁকড়া আছে। চল আমরা সেখানে চলে যাই। এই বন বনদস্যুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা যাব। ফরেস্ট অফিসাররা ঘুষ খেয়ে ঘুমিয়ে থাকলেও আমরা চলে যাব।'

এর মধ্যে সেজো বাঘ মামা মানে তামিম মামা বলল, 'সে কী বড় ভাই!' অমনি বড় বাঘ মামা গা-গা করে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'অ্যাই তোকে না বলেছি নাম বলবি?' শুনেই সেজো বাঘ মামা বলল, 'থুক্কু, সে কী– এই... কী... বলে গিয়ে মাশরাফি ভাই! সেই চর সব দুষ্টু বানরে ভর্তি।'

তখন মেজো বাঘ মামা মানে সাকিব মামা বলে উঠল, 'আরে রাখো তোর দুষ্টু বানর, গিয়ে এমন সব ঘূর্ণি দেব না তাতে চোখে সব সর্ষে ফুল দেখবে।'

শিয়াল এসব কথাবার্তা শুনে টুনে একটু ভ্যাবাচেকা মেরে গেল। মনে মনে বলল, 'না না, মারামরি করে আমি পারব না। আমি

শিয়াল পণ্ডিতের বংশধর। বুদ্ধি দিয়েই সব জয় করতে হবে।' সে মুখ ফুটে বলল, 'আচ্ছা সাকিব মামা, মারামরি না করে ওদের ওখানে শিক্ষকতা করা যায় না? শিক্ষকদের কিন্তু একটা মান-সম্মান-ভাব-গাম্ভীর্য আলাদা।'

এ কথা শুনেই বড় বাঘ মামা 'হালুম' করে খুব জোরে তাড়া দিল। তাতে শিয়াল ভ্যাবাচেকা মেরে বেলুনের মতো চুপসে গেল। তবুও সে মনে মনে শিক্ষকতার ইচ্ছাটা ধরে রাখল।

তারা সেই নতুন চরে গেল। চরের একটা নাম দিতে হবে। বড় বাঘ মামা বলল, 'এ চরের নাম থাকবে টাইগারচরা।' শিয়াল মনে মনে বলল, 'শিয়ালচরা হলে ভালো হতো।' শেষ পর্যন্ত নাম হলো ক্রিকেটচরা।

সেই চরের জঙ্গলে নতুন সবুজ পাতার গাছের মধ্যে একদিন দুপুরবেলা শিয়াল একা একা হাঁটছে। এমন সময় একদল বানর হুটহাট করে গাছ থেকে নেমে শিয়ালকে ঘিরে ধরেছে। বানরদের সব তেড়ে আসা ভাব। ধারে কাছে কোনো বাঘ মামাও নেই। একটা বানর শিয়ালের প্রায় কানে হাত দিয়ে বলল, 'এবারে পণ্ডিত মশাই! কী উপায় হবে তোর? নিজের এলাকা ছেড়ে এখানে এসেছিস আমাদের ভাত মারতে?' এ কথা শুনে শিয়াল বলল, 'কী অসভ্য ছাত্র তোমরা হে? শিক্ষককে তুই-তোকারি করছ!'

এ কথায় বানররা হঠাৎ চুপ হয়ে এর-ওর মুখের দিকে তাকাতাকি করল। তারপর এক বানর শিয়ালের গালে প্রায় চড় মেরে বলল, 'অ্যাই কে তোর ছাত্র রে?, কে আমাদের শিক্ষক রে?'

ভাবগতিক দেখে শিয়াল বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, একটা অঙ্ক দেব, পারলে তোমরা আমায় যা শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেব। আর তোমরা না পারলে আমাকে রেহাই দেবে।' শিয়ালের প্রস্তাব শুনে

বানররা সবাই খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠল। বলল, 'বল দেখি, কী তোর অঙ্ক?' শিয়াল বলল, 'বলো তো শূন্য আর শূন্য যোগ করলে কত হয়?' এ অঙ্কের কথা শুনে বানররা আবার একযোগে খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'আম আর কাঁঠাল যোগ করলে যা হয়–এর উত্তর তাই হয়!'

এমন উত্তর শুনে শিয়াল ভ্যাবাচেকা মেরে গেল। মুখ টুক কুঁচকে খানিকটা ভেবে বলল, 'উত্তর সঠিক!', বলেই দে দৌড়, মুখ উঁচু করে নাকে-মুখে-চোখে হাওয়া বাজিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে এক দৌড়ে সুন্দরবন পেরিয়ে একেবারে সেই নদীর ধারে এসে থামল শিয়াল। তারপর লোকালয়ে ওঠার জন্য নদীতে ঝাঁপ দেয়ার আগে সুন্দরবনের দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কোথাও যখন জায়গা হলো না, তখন দেখি, কুকুরের সাথে বন্ধুত্ব করা যায় কিনা।'

কিটিকিটি কিররিট

একটা দাঁড়কাক পেয়ারা খাচ্ছে। তা দেখে কাঠবিড়ালি বলল, এ কী কাক সাহেব! আপনি আমার পেয়ারা খাচ্ছেন কেন? শুনেছি আপনি সাবান-টাবান খান, তা তাই খেতে পারতেন! কাক আরামছে চোখ বুজে পেয়ারা খাচ্ছে আর ভাবছে, সাড়ে তিন মাস শুধু সাবান খেয়ে দিন কেটেছে। আজ যখন পাকা পেয়ারা হাতের মধ্যে পেয়েছি, তখন আর ছাড়ছি না। কাকটা কাঠবিড়ালির কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু খেয়েই যাচ্ছে। কাঠবিড়ালি কাকটার সামনে অন্য একটা ডালে বসে ছিল। সে তখন একটু রাগ করে বলল, এই পেয়ারাটা আমি আগেই খেতে পারতাম। শুধু একটু ভালো করে পাকলে খাব বলে আজ আড়াই দিন চৌকি দিয়ে রেখেছি। ডেও পিঁপড়ের কামড় খেয়েছি। বিচ্ছু ছেলেপিলের লাঠি খোঁচা খেয়েছি আর আপনি কোথাকার কে এসে হাপুস-হুপুস করে খাচ্ছেন! যান না, সাবান খান না!

কাক চোখ বুজে খেতে খেতে কাঠবিড়ালিকে বলল, লোকে বলে ছাগলে কিনা খায়-কাকে কিনা খায়। তোরাও তো কম কিছু খাস না, ফলমূল গাছের পাতা, ডাঁটা– সব তো তোরা খাস। তা আজ যা না, আজ সাবান খেয়ে দেখ না! এ কথা শুনে কাঠবিড়ালি জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁটটা একটু চাটল। ভাবল সাবান একটু চেখে দেখা যায়।

সে তাড়াতাড়ি কাক সাহেবকে কাক ভাই সম্বোধন করে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, কাক ভাই, সাবান কেমন খেতে? আমার মাঝে মধ্যে সাবান খেতে ইচ্ছে করে। কাক বলল, খুব ভালো খেতে। এত ভালো যে, মুখ পরিষ্কার হয়ে যায়। তুই তো দাঁত মাজিস না। যা সাবান খেয়ে আয়, দাঁত পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাঠবিড়ালি তক্ষুনি মুখ-চোখ সিঁটকে নিজের দাঁত দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু নিজের দাঁত তো নিজে দেখা যায় না, সেও পারল না। তারপর লেজ উঁচিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে আর মুখে 'কিটিকিটি কিররিট, কিটিকিটি কিররিট' বলতে বলতে সাবান খেতে গেল।

পাশের বাড়ির এক বারান্দার কোণে একটা কাপড় কাচা সাবান ছিল। সাবানটা ঘষে ঘষে খুব ছোট হয়ে গেছে। কাজের বুয়া জামাকাপড় কাচার জন্য সাবানটা বারান্দায় রেখে ঘরে জামাকাপড় আনতে গেছে। আর সেই ফাঁকে কাঠবিড়ালি মহা আনন্দে সাবানে একটু কামড় দিয়েছে। প্রথম প্রথম সাবানের স্বাদ বুঝতে পারেনি, তাই মনে মনে ভাবছে, বাহ! একেবারে অন্যরকম স্বাদ! আর দুটো থাকলে ছেলেমেয়েদের জন্যও নিয়ে যেতাম! এতদিন কেন এসব খাইনি! কাঠবিড়ালি ভাবছে আর গপগপ করে খাচ্ছে। কিন্তু সাবান কী আর খাওয়া যায়! কাপড় কাচা সাবানে থাকে ক্ষার, তা কাকের বাঁশচোঁচা ঠোঁটে সইলেও কাঠবিড়ালির ফল-ফলারি খাওয়া জিভে সয় না। কিছুক্ষণ পরেই একটা বিশ্রী, স্বাদহীন, সাবান সাবান গন্ধ কাঠবিড়ালির সমস্ত মুখে-জিভে ভরে গেল। আর গালটা নোনতা নোনতা হয়ে গেল। সে 'ওয়াক ওয়াক' করতে লাগল আর 'কিটিকিটি কিররিট, কিটিকিটি কিররিট' বলতে বলতে বলল, 'লবণ দিয়েছে! লবণ দিয়েছে! এটা আর খাব না! অন্য একটা খাব! কিছুক্ষণের মধ্যে কাঠবিড়ালির পেটের মধ্যে সাবান ফেনিয়ে উঠল। তার সমস্ত গা গুলিয়ে উঠল। তার মনে

হচ্ছে মুখের মধ্যে কে যেন আস্ত একটা ন্যাকড়া গুঁজে দিয়েছে। অস্বস্তিতে কাঠবিড়ালি লেজটা মাটিতে একবার এদিকে একবার ওদিকে বাড়ি মারতে লাগল। আর 'কিটিকিটি কিররিট, কিটিকিটি কিররিট, ওরে মারে! লোভ করে কেন সাবান খেলাম রে! গাল হেজে গেল রে! গালে ঝামা ঘষে দিল রে! ওয়াক থু! আর সাবান খাব না, আর সাবান খাব না' বলতে লাগল। পাশের পেয়ারা গাছ থেকে কাঠবিড়ালির এই কাণ্ড দেখে সেই কাকটার খুব হাসি পেল।

কাকটা হাঁ করে কাক কাক করে যেই হাসতে গেছে, আর অমনি মুখ থেকে আধখাওয়া সেই পেয়ারাটা টুপ করে মাটিতে পড়ে গেল। তা দেখে কাঠবিড়ালি 'কিটিকিটি কিররিট' বলে দৌড়ে সেই পেয়ারাটা তুলে ঘাস বনের মধ্যে চলে গেল। পেয়ারা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে কাক বলল, পেয়ারাটায় কী বিচ্ছিরি সাবান সাবান গন্ধ রে বাবা! মনে হচ্ছে সাবান দিয়েই পেয়ারাটা তৈরি! এ পেয়ারা আমি খাব না! ও মা! গা গোলাচ্ছে রে! কাঠবিড়ালি লোভ করে কেবল সেই পেয়ারাতে কামড় দিতে যাচ্ছিল। কাকের মুখে পেয়ারায় সাবানের কথা শুনে খুব করে কী একটা চিন্তা করে দুর ছাই বলে পেয়ারাটা সেখানে ছুড়ে ফেলে দিল। আর তক্ষুনি কাকটা গাছ থেকে নেমে সেই পেয়ারাটা নিতে গেছে, এমন সময় সেই কাজের বুয়া 'সাবান খেয়েছে, সাবান খেয়েছে' বলতে বলতে কাকের গা তাক করে খুব জোরে ছুড়ল এক ঢিল। আর অমনি ভয়ে পেয়ারা টেয়ারা ফেলে কাকটা কা-কা করতে করতে একেবারে আকাশে উড়ে পালিয়ে গেল।

বাঘের ভয়

বাদার পাশে নদীর ধারে বাস করত এক জেলে। সারাদিন ঝলমলে রোদে জেলের খুব ভালো লাগত। কিন্তু রাত হলেই লাগত ভীষণ ভয়। কারণ সেই বাদায় থাকত এক মানুষখেকো বাঘ। সেই বাঘটা জেলের দুটো ছেলেকে খেয়ে ফেলেছে। জেলের ঘরের পাশে একটা সুন্দরী গাছের গোড়ায় জেলের ছোট ছেলের মুণ্ডু পাওয়া গিয়েছিল।

বাঘের ভয়ে আর ছেলে হারানোর দুঃখে জেলে যখন অন্য জায়গায় চলে যাবে ভাবছে, ঠিক তখন এক বানর এসে জেলেকে বলল, 'জেলে ভাই, আমি তো গাছে গাছে থাকি। যখন শয়তান বাঘটা আসবে, আমি গাছের ওপর থেকে তা দেখতে পাব। আর সাথে সাথে শিস দিয়ে তোমাকে জানিয়ে দেব। তখন তুমি গা ঢাকা দিও।' বানরের কথা জেলের খুব ভালো লাগল, সে বানরকে দুটো চকলেট খেতে দিয়ে বলল, 'আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু।'

এক রাতে হয়েছে কী! জেলে খেয়ে দেয়ে দাঁত মেজে কেবল শুতে যাবে। এমন সময় বানরটা শিস দিয়ে জোরে বলে উঠল, 'জেলে ভাই সাবধান! মানুষখেকো বাঘটা তোমার ঘরের দিকে আসছে।' এ কথা শুনে জেলের খুব ভয় লাগল। সে তাড়াতাড়ি ঘরের আলো নিভিয়ে দিল।

হঠাৎ চারিদিক থমথমে হয়ে গেল। মাটিতে বাঘের পা ফেলার দুম

দুম শব্দ হতে লাগল। দূরে জঙ্গলে কটা পাখি চেঁচিয়ে উঠে শান্ত হয়ে গেল। ঘরের অন্ধকারে জেলে আস্তে আস্তে পা ফেলে জানালার কাছে এসে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে দেখতে লাগল। বাইরে তখন অল্প চাঁদের আলো। সে আলোতে জেলে দেখতে পেল ইয়া বড় ডোরাকাটা এক বাঘ। সে হেতাল গাছের ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে জেলের ঘরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। বাঘের চোখ দুটো টর্চ লাইটের মতো জ্বলছে।

বাঘটা কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা ভেঙে জেলের ঘরে ঢুকবে আর ঘাড় মটকিয়ে জেলেকে খাবে। জেলে ভয়ে কাঁপছে। জেলে তখন করল কী, আস্তে আস্তে ঘরের চালের কাছে বাঁশের আড়ার উপর উঠে গুটিসুটি মেরে বসে থাকল। যেন ঘরে ঢুকে বাঘ তাকে না দেখতে পায়।

কিছুক্ষণ পর বাঘটা হালুম করে দরজা ভেঙে জেলের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ওরে বাপরে! কী বিশাল চেহারা! ধারালো দাঁতগুলো জেলেকে আস্ত চিবানোর জন্য অন্ধকারে চকচক করছে। আর এক হাত লম্বা লোভা জিভটা লক লক করছে। হাত-পায়ের থাবা থেকে ছুরির মতো লম্বা লম্বা নখগুলো কিলবিল করে বেরিয়ে আসছে। বাঘ ঘরের চারকোণায় জেলেকে খুঁজছে। যেদিকে তাকাচ্ছে সেদিকে চোখ থেকে টর্চের মতো আলো পড়ছে। আর জেলেটা উপরের দিকে বাঁশের আড়ার উপর ভয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আড়াটা শক্ত করে ধরে শুয়ে আছে। জেলে যে উপরে আছে বাঘ তা দেখতে পাচ্ছে না। বাঘটা জেলেকে না দেখতে পেয়ে রাগে গজগজ করতে করতে বিরাট জোরে 'হালুম হালুম' বলে গর্জন করে উঠল। সেই বিশাল গর্জনে ঘরদোর কেঁপে উঠল আর বাঁশের আড়াসুদ্ধ ভেঙে বাঘের ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে জেলে পড়ে গেল। ঘাড়ের ওপর

আচমকা কী পড়তে দেখে বাঘটা ঘাবড়িয়ে গেল। আর বলল, 'স্যার, আমাকে মারবেন না।' এ কথা শুনে জেলে সাহস পেল, সে তখন সেই বাঁশটা দিয়ে বাঘের পিঠে ধুমাধুম পেটাতে লাগল। পেটানোর চোটে বাঘ চোখে-মুখে অন্ধকার দেখল। জেলে বাঘটিকে পিটিয়েই চলেছে, পিটিয়েই চলেছে। পিটুনি খেয়ে বাঘটা মাটিতে শুয়ে পড়ল। আর হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ওরে বাবারে! ওরে মারে! আমার ল্যাজে মারবেন না স্যার, আমার ল্যাজে ব্যথা।' এ কথা শুনে জেলে মনে মনে বলল, 'দাঁড়া, ব্যথা জায়গায় ব্যথা দিলে আরাম বুঝবি' বলেই লেজ ধরে দিল হ্যাঁচকা এক টান। আর মহাব্যথায় কঁকিয়ে উঠে বাঘটা কেঁদে বলল, 'ওরে মারে! লেজ ছিঁড়ে গেল রে!' কিন্তু কে শোনে কার কথা। জেলে তখন বাঁশ দিয়ে বাঘের লেজের ব্যথা জায়গায় দিল দশাসই এক বাড়ি। আর অমনি ব্যথায় বাঘের মুখে এমন টাস লেগে গেল যে আধাঘণ্টা পরে গিয়ে তার কান্না বেরুল। হরদম মার খেয়ে বাঘ যে সেই ছুট দিল, একেবারে সেই দেশ পার হয়ে অন্য দেশে গিয়ে তা থামল। সেই থেকে আর কখনও বাঘটা এদিকে আসেনি।
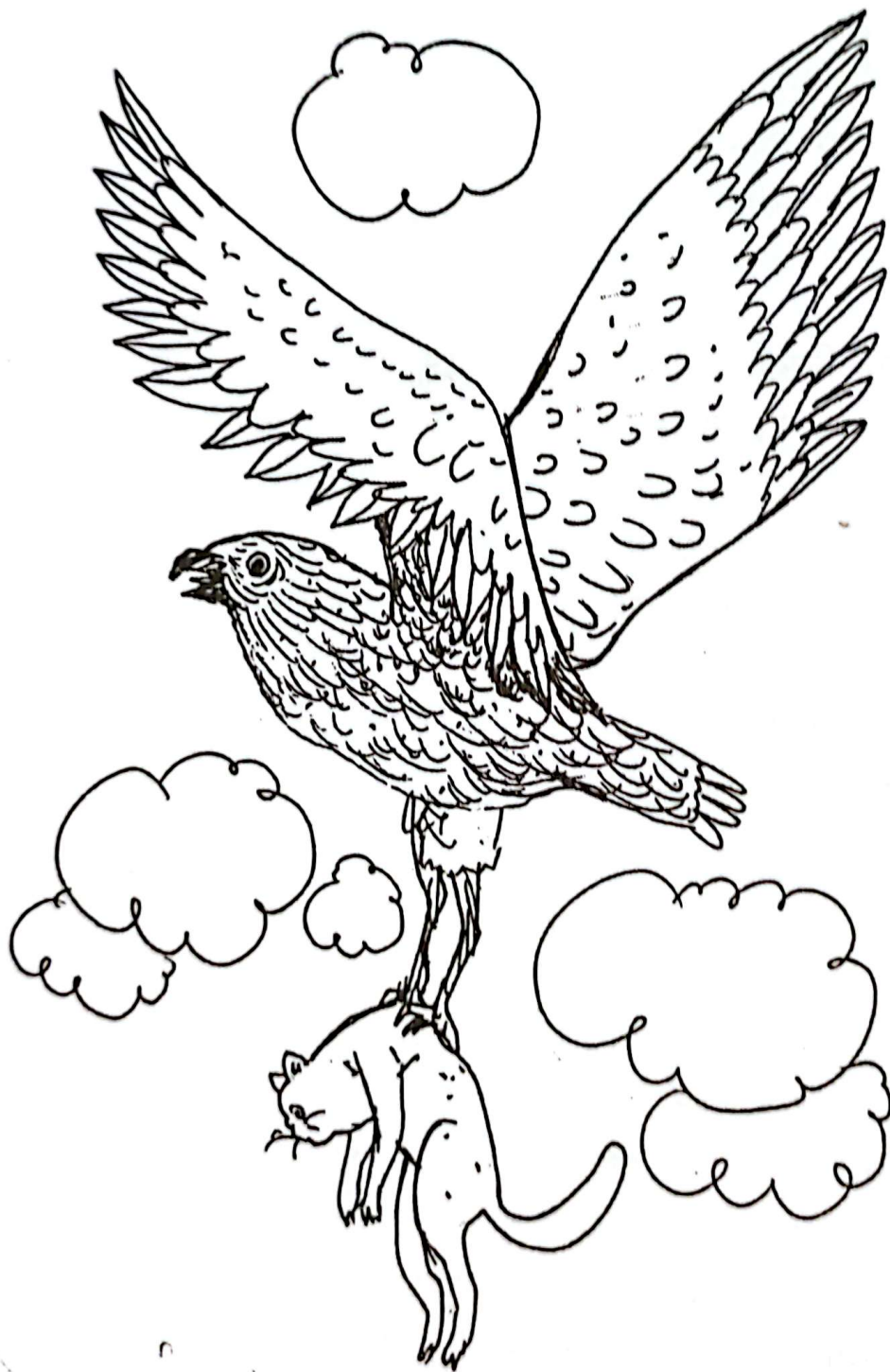
মিলেমিশে

ঝিনাদের বিড়ালটি খুব বদ। শুধু মিথ্যে কথা বলে। অন্য বিড়ালদের সাথে ঝগড়া বাধায় আর চুরি করে খায়। কিন্তু ঝিনাদের কুকুরটি খুব লক্ষ্মী, সাদাসিধে। সে খায় আর উঠোনে সামনের দুই পা মেলে তার ওপর মাথা রেখে ঘুমোয়। কুকুরটি যখন ঘুমোয় তখন বিড়ালটির খুব দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করে। সে চুপিচুপি ঘুমন্ত কুকুরের কাছে গিয়ে টুপ করে ওর লেজে একটা আঁচড় দিয়ে দে দৌড়। এক দৌড়ে বরান্দার গ্রিলের মধ্যে এসে মিচকি মিচকি হাসে।

ঝিনাদের বারান্দার দেয়াল আর ছাদের মাঝে ফাঁকা জায়গায় কদিন ধরে একটা চড়ুই পাখি বাসা বানিয়েছে। চড়ুইটাকে দেখার পর থেকে তাকে ভুলতে পারছে না বিড়ালটি। শুধু ভাবে কখন সে চড়ুইকে ধরে খাবে। তবে চড়ুইপাখি ধরা খুব কঠিন। ওরা ফুড়ুত ফুড়ুত করে উড়ে বেড়ায়। বিড়াল তো আর উড়তে পারে না। সে ভাবে, কী করে চড়ুই ধরা যায়।

একদিন দুপুরবেলা ঝিনাদের বারান্দায় রোদ পড়েছে। চড়ুই তখন বাসায় ছিল না। বিড়াল রোদে শুয়ে শুয়ে ভাবল, একবার লাফ মেরে দেখি তো! চড়ুইয়ের বাসাটি হাতে পাই কিনা! বিড়াল অমনি বারান্দা থেকে দুম করে ওপরের দিকে লাফ দিল। কিন্তু বেশিদূর উঠতে পারল না, আবার দুম করে বারান্দায় পড়ে মাজায় ব্যথা পেয়ে! ম্যাও

ম্যাও' করতে লাগল। 'ম্যাও ম্যাও' মানে খুব লেগেছে। বিড়াল ভাবল বুদ্ধি করে চড়ুইটিকে ধরতে হবে।

একদিন সকালবেলা চড়ুইটি বাসা থেকে মুখ বের করে বসে আছে। উঠোনের লেবু গাছে উড়ে যাবে যাবে ভাবছে। তখুনি বিড়ালটি দেয়ালের নিচে দাঁড়িয়ে চড়ুইয়ের দিকে মাথা উঁচু করে বলল, 'চড়ুই সোনা, আমার পিঠটি বড় চুলকাচ্ছে, একটু চুলকিয়ে দেবে?' চড়ুই বড় বুদ্ধিমান। সে বলল, 'না না, সে হবে না, আমি তোমার পিঠ চুলকে দিই, আর অমনি তুমি খপ করে ধরে আমাকে খাও! ও আমি পারব না, তুমি তোমার ছেলে মেয়েদের বলো।'

চড়ুইয়ের কথা শুনে বিড়ালটি মনে মনে বলল, 'এ তো দেখছি আমার চেয়েও বদ, দাঁড়া অন্যভাবে তোকে শায়েস্তা করছি।'

বিড়াল তখন কুকুরের সাহায্য নেয়ার জন্য কুকুরের লেজে থাবা মেরে আদর করে কুকুরের সাথে ভাব জমাতে গেল। এমনিতেই বিড়ালের ওপর কুকুরের আগে থাকতে একটা রাগ আছে। সময়ে অসময়ে বিড়ালটি তাকে জ্বালাতন করে। কুকুর ভীষণ জোরে 'ধর! দাঁড়া!' বলে বোমার মতো গর্জন করে উঠল।

আর বিড়ালটি 'কী হলো!' বলে লাফিয়ে তিন হাত ওপরে উঠে পড়ে প্রাণপণে মাজা বেঁকিয়ে দে ছুট। ছোটার জোরে আর ভয়ে সে বারান্দায় না উঠে তাড়াতাড়ি একটা ছোট লিচু গাছে গিয়ে উঠল। লিচুগাছটির মাত্র দুটো ডাল। সরু সরু, বিড়ালের ভারে একটা ডাল দুলছে, ভেঙে যায় যায় অবস্থা! কুকুরটিও গ্যাক গ্যাক করে তেড়ে এসে সেই গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রেগে চিৎকার করে বলল, 'শালা পাজি ছুঁচো বিটকেল কেলো মেচি! নেমে আয়! তোর ঘাড় মটকিয়ে আমার আর কাজ!' বিড়ালটি ভয়ে কান মটরসাইকেলের হ্যান্ডেলের মতো করে ভাঙা গলায় 'খ্যা-ও খ্যা-ও' করতে লাগল। চড়ুইপাখিটি

তাই দেখে পাশের লেবুগাছের ডালে দাঁড়িয়ে দুই পা দিয়ে হাততালি দিতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। ডানা থাকায় ওমা! বলে উড়ে আরেকটা ডালে গিয়ে বসল।

কুকুর ভীষণ রেগে আছে দেখে বিড়াল বলল, 'কুকুর ভাই, আমাকে ছেড়ে দ্যাও!' কুকুর বলল, 'শালা ছুঁচো! আর একটু হলেই পড়ে যাবি, আর আমি খপ করে ধরে তোর ঘাড় ভেঙে দেব!'

বিড়ালের খুব চিন্তা হলো, যে ডালে দাঁড়িয়ে আছে সেটাও খুব দুলছে। বিড়াল তখন বুদ্ধি করল, দরদ দিয়ে বলল, 'এক যে ছিল কুকুর, সে খুব ভালো, একদিন এক বিড়াল বিপদে পড়লে সে বাঁচিয়ে ছিল।' এ কথা শুনে কুকুরের মন নরম হয়ে গেল। কুকুর ভাবল, 'আমিও ভালো হব।' কুকুর তখন হাঁক-ডাঁক বন্ধ করে চুপ করে সেখানে বসে থাকল, সেখান থেকে নড়ছে না।

বিড়াল তাই দেখে বলল, 'আহা! কুকুরটি খুব ভালো, খেঁকিতে তার খাবার খেয়ে যাচ্ছে দেখেও কিছু বলে না।' কুকুর বলল, 'কী...! খেঁকিতে আমার খাবার খাচ্ছে! দাঁড়া!' বলেই সেখান থেকে ছুটে বাড়ির পেছনে চলে গেল, আর তক্ষুনি বিড়ালটি লিচুগাছ থেকে নেমে এক দৌড়ে বারান্দায় উঠে গ্রিলের ধারে বসে হাঁপাতে লাগল।

কুকুরটি বাড়ির পেছনে যেখানে ওর খাবার দেয়া হয়, সেখানে দৌড়ে গিয়ে দেখে কোথাকার কোন খেঁকিকুত্তা আরামছে গবগব করে তার খাবার খাচ্ছে। কুকুরটা ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'অ্যাই! অ্যাই!, তুই কোথাকার কে রে! আমার খাবার খেয়ে যাচ্ছিস! দাঁড়া শালা নাখেকো শুকনো খেঁকি!'

খেঁকি তিনদিন কিছু খায় না। এমন খাবার পেয়ে সে মনে মনে বলল, 'যা বলার বলো, আমি এ খাবার না খেয়ে ছাড়ছি না।'

কুকরটি খেঁকির পেছনে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'কী রে! তুই

সরছিস না কেন?' খেঁকি 'খ্যাঁ-অ্যা' করে উঠে লেজটা সোজা করে দুই পায়ের মাঝখানে দিয়ে বলল, 'এক যে ছিল কুকুর, সে খুব ভালো, ক্ষুধার্ত খেঁকিকে খাবার খেতে দিয়েছিল।' তাই শুনে কুকুরটি শান্ত হলো, আর 'হুম' বলে খালি মুখ চাটতে চাটতে উঠোনে এসে বসল।

কুকুরটিকে দেখে বিড়াল বারান্দা থেকে বলল, 'ওরে ন্যাকা-বোকা কুকুর! তোকে ফাঁকি দিয়ে ও পাড়া থেকে আর একটা মেচি কুকুর খাবার খেয়ে গিয়েছিল।' এই না শুনে কুকুর খুব রেগে গেল। সে বিড়ালের কথা বিশ্বাস করল। সে তখন ছুটে ও পাড়ায় সেই মেচি কুকুরের সাথে মারামারি করতে গেল। আর পাড়ার একদল কুকুরের হাতে দারুণ পিটুনি খেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চোখে-মুখে কামড়ানো দাগ নিয়ে বাড়িতে এলো। তাই দেখে বিড়ালটি বলল, 'ঠিক হয়েছে! ঠিক হয়েছে! শালা গাধা তোর ঠিক হয়েছে!' বিড়ালের কথা শুনে কুকুরটির ভীষণ রাগ হলো, মনে মনে সে বলল, 'শালা মেচি! একবার আয় উঠোনে! তখন দেখাব মজা!'

এদিকে চড়ুই খাওয়ার লোভ আর সামলাতে পারছে না বিড়াল। যে করেই হোক চড়ুইকে ধরতে হবে। সে চড়ুইয়ের বাসার নাগাল পাওয়ার জন্য 'জাম্পিং' বা 'লাফ' প্র্যাকটিস করছে। লাফ প্র্যাকটিস করতে করতে হঠাৎ দুম করে বারান্দা থেকে উঠোনে পড়ে গেল। আর যাবে কোথায়? সেই কুকুর 'খাঁ খাঁ' করতে করতে তেড়ে এলো। বিড়াল এবারও দিগ্বিদিক ঘুরে বারান্দায় না উঠতে পেরে একটা বড় জামরুল গাছে উঠল। এ গাছটা অনেক বড়, বেশ ঝাঁকড়ানো, সব মোটা মোটা ডাল। বিড়াল বেশ উঁচুতে একটা মোটা ডালে বসে কুকুরকে ভ্যাংচাতে লাগল। বিড়াল জানে, কুকুর কখনও এ গাছে উঠতে পারবে না। আর সেও বেশ উঁচুতে নিরাপদে আছে। বিড়াল ভেংচি কেটে বলল, 'কি রে কুকুর! কেমন মার খেলি?'

এ কথা শুনে কুকুর ভীষণ ক্ষেপে গেল। সে রাগে শুধু মাথা ওপরের দিকে ঝাঁকি মারতে লাগল আর ঘেউ ঘেউ করে বিড়ালকে শয়তান, চোর, গেছো ইত্যাদি গালাগালি করতে লাগল। এর মধ্যে হয়েছে কী! বিড়াল যখন নিচের দিকে তাকিয়ে কুকুরটাকে দেখছিল, ঠিক তখন একটা বাজপাখি তার লম্বা নখ দিয়ে খপ করে বিড়ালটিকে ধরে আকাশে ওড়া শুরু করল।

বিড়াল প্রথমে বুঝতে পারেনি। সে ভাবল, কে যেন তার কান ধরে আকাশে ওড়াচ্ছে। একবার কুকুরটার কথা মনে হলো, কিন্তু কুকুর তো এ কাজ করতে পারে না। কিছুক্ষণ পরে বিড়াল দেখল একটা বাজপাখি। দেখেই বিড়ালের আত্মারাম খাঁচায় উঠে গেল। বাজপাখি ভীষণ ভয়ানক। তারা বেজি, শিয়াল, ছাগল, কুকুর পর্যন্ত ধরে ধরে নিয়ে খায়।

বিড়াল তখন ভয়ে গলা ছেড়ে দিয়ে আকাশের মধ্যে উড়তে উড়তে বলল, 'এক যে ছিল বাজপাখি, সে খুব ভালো, সে বিড়ালকে ছেড়ে দিয়েছিল।' কিন্তু কে শোনে কার কথা। বাজপাখি তার এক পায়ের নখ দিয়ে ধরে বিড়ালকে নিয়ে আকাশে চক্কর দিতে লাগল।

বিড়াল দেখল ভাব বেগতিক। আজ নির্ঘাত বাজপাখির পেটে যেতে হবে। সে তখন মরণপণে বাজপাখির পা কামড়ে ধরল। বাজপাখি কামড়ের জ্বালায় এক পা ছেড়ে আরেকটি পা দিয়ে বিড়ালটিকে ধরতে গেছে তখুনি নখ থেকে ছাড়িয়ে বিড়ালটি হুস হুস করে তারা খসার মতো পড়ে যেতে লাগল। বাজপাখি আকাশে ডিগবাজি খেয়ে নিচে ধেয়ে এসে বিড়ালকে আবার ধরতে যাবে। এ সময় বিড়ালটি চ্যাংদোলা হয়ে আমড়া গাছের ডালের মধ্যে পড়ল। তাই বাজপাখি আর ধরতে পারল না। বিড়ালটি 'খ্যাঁক' করে উঠে আমড়ার এ ডাল থেকে ও ডালে পড়তে পড়তে একেবারে নিচের পুকুরের জলে ঝপাং

করে পড়ল। পড়েই সে কাহিল, সাঁতার কাটার শক্তি নেই। পানিতে ভেসে আছে। বাজপাখি তখনও আকাশে চক্কর দিচ্ছে। বিড়াল ভয়ে যখন সেদিকে তাকিয়ে আছে, তখন কে যেন তার ঠ্যাং ধরে খচাং করে ডাঙায় তুলল। ভয়ে ব্যথায় ভেজা বিড়াল দেখল সেই কুকুরটা তাকে ডাঙায় তুলে পাশে জিভ মেলিয়ে বসে আছে। কুকুর বলল, 'এবার থেকে আশা করি ভালো হয়ে চলবে।'

বিড়াল হেসে উঠল, সেদিন থেকে সে আর চড়ুইপাখিকে খেতে যেত না। তারা সবাই এখন মিলেমিশে একসাথে থাকে।

শিয়াল ও কুকুর

বন আর লোকালয়ের মাঝে একটা খাল। খালের নাম প্রাণসায়র। প্রাণসায়রের ওপর এক জায়গায় দুটো সরু বাঁশের জোড়াতালি দেয়া সাঁকো।

বনের এক শিয়াল সাঁকো পার হয়ে লোকালয়ে যায় মুরগি খেতে। একদিন মুরগির লোভে শিয়াল শেখদের বাড়ির উঠোনে উঁকি দিয়েছে। ওদের বাড়ির বুড়ো কুত্তাটা দেখতে পেয়ে 'ঘেউ ঘেউ' করতে করতে তেড়ে এলো। তাই দেখে শিয়াল লেজ উঁচিয়ে কচুক্ষেত চিরে খই গাছের পাশ কাটিয়ে এক দৌড়ে সেই খালের ধারে সাঁকোর পাশে এসে থামল। মুরগি খেতে না পেরে রাগে গজগজ করছে শিয়াল। 'আবার যাব যাব' ভাবছে, ঠিক তখনই দেখল ভাঁটফুল গাছের বন নাড়িয়ে সেই বুড়ো কুত্তাটা 'গাফ গাফ' করতে করতে দৌড়ে আসছে। রাগে ক্ষোভে শিয়াল মনে মনে ভাবল, 'কেন যে আল্লাহ আমাদের কুকুর না করে শিয়াল করে রেখেছে!' তারপর 'এভাবে না খেয়ে মরার চেয়ে প্রাণ যায় যাবে, তবু কুকুরের সাথে ফাইট করব' ভেবে খুঁটো মেরে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু বুড়ো কুত্তাটার খ্যাপা-ত্যাড়া ভাব দেখে ভয়ে বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তিড়িং-বিড়িং করে সাঁকো পার হয়ে ওপারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

শিয়াল সাঁকো পার হয়ে বনের পাড়ে চলে গেছে। তাই দেখে কুত্তাটা সাঁকোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে শিয়ালের দিকে তাকিয়ে ঘ্যাও ঘ্যাও করে মনের রাগ ঝারল। কুত্তাটা শিয়ালকে ধরবে বলে রাগে সাঁকোর বাঁশে পা দিতে গেল। কিন্তু সরু তেলসা বাঁশে উঠে পড়ে যাবে ভেবে আবার হুট করে পিছিয়ে গেল।

শিয়াল তা লক্ষ্য করল। তাই কুকুরের অপারগতা বুঝে সে কুকুরটিকে খেপিয়ে নিজের রাগ মেটানোর চেষ্টা করল। শিয়াল বলল, 'আয় না! সাঁকো পার হয়ে আমাকে ধর! কেলো-বুড়ো-মুলো কুত্তা কোথাকার!' লোকালয়ের পাড় থেকে কুকুর খাঁক খাঁক করে বলল, 'দেখবি! একবার ধরতে পারলে আরাম টের পাবি, শালা মুরগি চোর!'

শিয়াল বলল, 'শালা এবার তোর বাচ্চাকেও চুরি করে খাব। খুব তো বাড়ির প'রে গেলে ধরতে পারিস! একবার কষ্ট করে এই সাঁকো পার হয়ে ধরতে আয় না! ঠ্যাং চিবিয়ে আলু ভরতা করে দেব।'

শিয়াল বলল, 'অত সাহস যখন, লেজ উঁচিয়ে দৌড়ালি কেন? পার হয়ে আয়! কে কাকে কী করে দেখবি। তুই তো পারবিনে এই সাঁকো পার হতে, সারাজীবন ছুঁচোমো করবি, আর লোকের ভাত মারবি।'

কুকুর ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'কী! আমায় ছুঁচো বললি! তবে রে! দাঁড়া!' বলেই কুকুর রাগে ওই সাঁকোর উপর উঠে গেল। কিছুদূর গিয়ে কুকুর আর ভালোভাবে পা ফেলতে পারে না। সামনের একটা পা হড়কে সরে যায় তো আর একটি পা দিয়ে কোনোভাবে ব্যালান্স রাখে। কিছুক্ষণ পরে পেছনের একটা পাও সরে যায়। কুকুরের চোখ সাঁকোর বাঁশের দিকে থাকে। শিয়াল বলল, 'শালা নড়বড়ে কাঁপারাম! এখন দৌড়ো দেখি! কেমন পারিস!' কুকুর হাঁচড়-পাঁচড় করতে করতে একটু মাঝখানের কাছে পৌঁছতেই শিয়াল পা দিয়ে দিয়ে সাঁকোর বাঁশে ঘা মেরে নাড়াতে লাগল। আর বলতে লাগল, 'শালা নাকেষ্টিম কেলো!

এখন সার্কাসের জোকারের মতো হেলছিস দুলছিস কেন? ধরতে আয়!' সাঁকোর বাঁশের নড়নের গুঁতোয় অনভ্যস্ত কুকুরের তিন পা হড়কে গেল, আর কুকুর ঝপাং করে খালের পানিতে পড়ে গেল। কুকুর মহারাগে বলতে লাগল, 'দাঁড়া! সাঁতরিয়ে পারে গিয়ে তোকে ধরব।'

শিয়াল ভাবল, 'তা-ও তো ঠিক! কুকুর তো সাঁতার কাটতে পারে!' তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'যদি ঢিল ছুড়তে পারতাম তবে তোর নাকে মারতাম, শালা পাজি, খেঁকি কোথাকার!'

কুকুর কষ্ট করে সাঁতার কেটে হাঁপাতে হাঁপাতে খালের ওপারে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বনের পারে উঠেছে। ততক্ষণে শিয়াল সেই সাঁকো পার হয়ে আবার লোকালয়ের পাড়ে চলে গেছে।

শিয়াল বলল, 'কীরে! ভিজে কুকুর! তোকে দেখে মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি কবরে যাবি!, খুব যে বলিস 'পালাই,' এখন আমি তোর পারে চলে এসেছি, দেখি কেমন ধরতে পারিস তুই!'

কুকুর হাঁপাচ্ছিল, শিয়াল আবার সাঁকো পার হয়ে হুট করে ওপারে চলে যাওয়ায় কুকুর একটু নিরাশ হলো। কিন্তু রাগ বেড়ে গেল দ্বিগুণ। সে বলল, 'এখন আমি ঘেউ ঘেউ বলে চেঁচাব আর পাড়ার কুকুর সব দল বেঁধে এসে তোকে ঠ্যাঙ্গাবে!'

এ কথায় শিয়াল একটু ঘাবড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি চারিদিকে তাকাল, তারপর বলল, 'থাম থাম!, আমিও হুক্কা হুয়া ডাক জুড়ব আর বনে কোনো শিয়াল আর থাকবে না। সব দলবেঁধে এসে তোকে একা পেয়ে চিড়ে চেবানোর মতো চেবাবে। তুই ডাকলে আমিও ডাকব।'

এর মধ্যে হয়েছে কী! বনপারের এক নারকেল গাছে এক ইঁদুর নারকেলের বোঁটা কামড়িয়ে কামড়িয়ে সরু করে ফেললে একটা

নারকেল ছিঁড়ে একেবারে কুকুরের লেজের পাশে দুড়ুম করে পড়ল। কুকুর শিয়ালকে কী একটা বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ গায়ের ওপর 'দুম পটাশ' শব্দ শুনে ভয়ে চিৎ হয়ে খালে পড়ে গেল। কুকুর ভাবল বনের শিয়াল মনে হয় এ কাজ করেছে। সে হাউমাউ ঘেউঘেউ করে ডাক জুড়ল। আর সেই ডাক শুনে লোকালয়ের কুকুরগুলো 'নে! নে!' করতে করতে ছুটে এসে দেখে খাল পাড়ে একটা শিয়াল দাঁড়িয়ে আছে। তারা তখন 'ধর শালারে! ধর শালারে!' বলতে বলতে তেড়ে আসছে। শিয়াল ভয়ে 'হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া' মানে 'সবাই আয়' বলে বাঁচার জন্য খালে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খালের পানিতে শিয়াল আর কুকুর ডুবে ডুবে মুখোমুখি অবস্থায় আছে। কে কাকে পানির ভেতর কামড়াবে, তাই কেউ কারো চোখ থেকে চোখ সরাচ্ছে না। কুকুর বলছে, 'খবরদার!,' শিয়াল বলছে, 'খবরদার!' কুকুর বলছে, 'যা না! তুই যা না, পারে উঠে যা!' শিয়াল বলছে, 'তুই যা না!'

এর মধ্যে খালের বনপাড়ে বনের সব শিয়াল আর লোকালয়ের পাড়ে লোকালয়ের সব কুকুর জড়ো হয়ে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করেছে। সেই চেঁচামেচির মধ্যে খালের পানিতে নাকানি চুবানি খেতে খেতে কুকুর আর শিয়াল একে অন্যকে বলছে, 'যা না! তুই যা!'

এদিকে কুকুর আর শিয়ালের একসাথে চেঁচামেচিতে ওই স্থানের পশুপাখি আর মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করতে শেষে র‍্যাব-পুলিশ এসেছিল শুনেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা করতে পেরেছিল কিনা জানতে পারিনি।

মোবাইল

ঝিনাদের একটা বিড়াল ছিল। বিড়ালটা খুব বুদ্ধিমান। ভীষণ দুরন্ত আর খেলাপ্রিয়। খাওয়া-দাওয়ার তো অভাব নেই। অন্য বাড়ির বিড়ালের মতো সে ঠ্যাঙা খায় না। বাড়ির মধ্যে ঝিনার ছোট কাকা বিড়ালটিকে খুব যত্ন করে। তাই সে রাতে ছোট কাকার ঘরে ঘুমোয়। কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে। বিড়ালটার হঠাৎ শিক্ষিত হতে ইচ্ছা হলো। আজকাল শিক্ষিত না হলে কী চলে? আসলে হয়েছে কী, ঝিনার ছোটকাকা ইয়া বড় স্ক্রিনের একটা মোবাইল ব্যবহার করে। রোজ রাতে বিড়ালটা দেখে যে ছোটকাকা মোবাইলে বেশ আদর করে হাত দেয়। কখনও মুখে দেয়, আবার কখনও সুন্দর সুর বের করে। তাই দেখে বিড়ালটার খুব ইচ্ছা করে মোবাইলে একটু হাত দিতে। মোবাইলে হাত দিলেই মনে হয় শিক্ষিত হওয়া যায়।
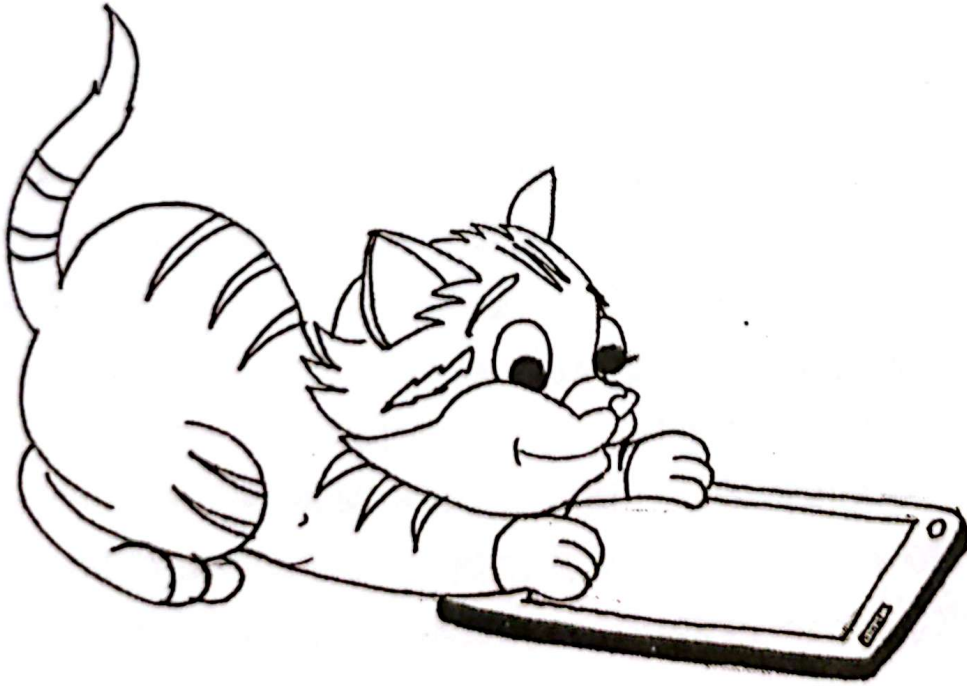
কিন্তু হাত দিতে ইচ্ছে হলেই তো আর হাত দেয়া যায় না। কে জানে যদি রেগে মেগে কান ধরে বাইরে বের করে দেয়। বাইরে একটা বদঘট কুকুরের ছেলে থাকে। সে খুব বাঁদর, একেবারে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে ঘাড় মটকাতে আসে। ওটার জন্য প্রাণ একবার যায়-যায় হয়েছিল।

কিন্তু তা হলে কী হবে। বিড়ালটা মোবাইলের লোভ যেন সামলাতে পারছে না। একদিন হয়েছে কী– অনেক রাত। ঝিনার ছোটকাকা ঘুমিয়ে পড়েছে। ফোঁস ফোঁস করে নাক ডাকছে। বিড়ালটা আর কিছুতেই থাকতে পারছে না। মোবাইলটা বালিশের কাছে থাকে। টিপ টিপ বুকে সে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে টুপ করে খাটের ওপর উঠে পড়ে। একেবারে ঠিক মোবাইলটার পাশে। বা! কী সুন্দর! কিন্তু কী করে ধরবে ওটি? একবার মুখ দিতে যায়, একবার থাবা দিতে যায় আবার একবার লেজ বুলিয়ে দেয়। শেষমেশ হাতা খামচা করে কোনোমতে পাঁজাকোলা করে মোবাইলটা নিয়ে তড়াক করে খাটের নিচে নেমে এলো।

তারপর খটখট করে কয়েকটা থাবা দিল। থাবা মানে হাত দেওয়া। অমনি মোবাইলটা জ্বলে উঠল। তাতে বিড়ালটা একটু ভয় পেয়ে খানিকটা সরে গেল। কিন্তু ভয় পেলে কী আর হবে? তক্ষুনি আবার ফিরে এসে ঝটপট থাবা দিতে লাগল। এই না করতে করতে সুন্দর একটা সুর শোনা গেল। আর অমনি স্ক্রিনে আর একটা বিড়াল ফ্যাকফ্যাক করে তাকাচ্ছে আর বলছে– হ্যালো, হ্যালো। রকম সকম দেখে ঝিনাদের বিড়াল কিছুক্ষণ হাঁ-করে থাকল, তারপর বলল, 'কে তুমি ভাই?, মোবাইলের মধ্যে কীভাবে এলে?' এই না শুনে স্ক্রিনের বিড়ালটা খুব করে হাসল, হাসতে হাসতে কোথা থেকে যেন পড়ে যাচ্ছিল। সামলে টামলে বলল, 'মোবাইলের মধ্যে আসব

কেন? তুমি আমার ছবি দেখতে পাচ্ছ, আমি তো ফাইভ জির (ফাইভ জি হলো মোবাইলের একধরনের নেটওয়ার্ক) মধ্যে আছি তাই।' ফাইভ জির কথা ঝিনাদের বিড়াল শুনে বলল , 'আমি ও নাম শুনিনি, আমি প্যাঁজির নাম শুনেছি। খুব ভালো লাগে খেতে, একবার... ' এই বলে থেমে গেল। কারণ একবার লোভের চোটে এক দোকানির দোকানে ঢুকে চুরি করে প্যাঁজি মানে পেঁয়াজি খেতে গিয়ে আচ্ছা ঠ্যাঙা খেয়েছিল। এক মাস গায়ের ব্যথায় নড়তে পারেনি, তা কী আর নতুন বন্ধুর কাছে বলা যায়! প্যাঁজির কথা শুনে স্ক্রিনের বিড়ালটা মুখটুখ সিঁটকে কী যেন ভাবল। হয়তো ভাবল এটা উন্নত কোনো জিনিস। ঝিনাদের বিড়াল বলল, 'তা তোমার নাম কী ভাই?' স্ক্রিনের বিড়াল বলল, 'জ্যাক হুলো, তোমার নাম কী বন্ধু?' জ্যাক হুলো নামটা শুনে বেশ পছন্দ হলো ঝিনাদের বিড়ালের। ভাবল আজ থেকে এরকম একটা ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি নাম আমার রাখতে হবে।

সে তখন তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার নাম জ্যাকুলিন বাবু। তবে ডাক নাম ম্যাও।' আসলে ওর নাম হচ্ছে ম্যাও, জ্যাকুলিন বাবু ওর নাম না। 'বা! কী চমৎকার নাম' বলে জ্যাক খুব করে হাসল। তাতে ম্যাও আবার একটু ঘাবড়ে গেল। ম্যাও বলল, 'তা বন্ধু তুমি থাকো কোথায়?' জ্যাক হুলো বলল, 'আমি জানিনে, তবে মানুষে বলে এ জায়গাটার নাম নরওয়ে।'

নরওয়ে নামটা শুনেই খানিকটা ভয় পেয়ে গেল ম্যাও। ও নামটার সাথে যেন 'হুক্কা হুয়া'র মিল রয়েছে। বলল, এ নাম আমি জন্মেও শুনিনি, আমাদের এখানে আমতলা, বেলতলা, কলাতলা, কচুক্ষেত এসব বেশ ভালো– এসব বলতে বলতে ম্যাও খুব চমকে উঠল। এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, নিশুতি রাত, মানুষেরা সব হাঁ-করে ঘুমুচ্ছে।

কিন্তু জ্যাকের গায়ে রোদের আলো লাগল কীভাবে? ম্যাও খুব করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, না, চারিদিকে অন্ধকার। আসলে হয়েছে কী, আমাদের এই পৃথিবীতে সব জায়গায় কিন্তু একই সময় রাত বা দিন হয় না। এই ধরো বাংলাদেশে যখন রাত, আমেরিকার অনেক জায়গায় তখন দিন। কেমন করে হয়? আমাদের পৃথিবীটা বলের মতো গোল। সূর্যের আলো যে পাশে পড়ে সে পাশে দিন হয় আর তখন অন্য পাশে ছায়া থাকে বলে অন্ধকার মানে রাত হয়।

বিড়াল কী আর তা জানে? সে শুধু ভেবে চিন্তে অস্থির। শেষমেশ ম্যাও প্রশ্ন করে, 'বন্ধু তোমার গায়ে রোদ পড়ছে কোথা থেকে?' এই না শুনে জ্যাক হুলো খ্যাঁক খ্যাঁক করে খুব একটু হাসল। বলল, 'বন্ধু, আমাদের নরওয়েতে এখন দিনের বেলা, আর তোমাদের ওখানে এখন রাত। মোবাইলের আলোয় আমি শুধু তোমার মুখখানা দেখতে পাচ্ছি।' এই কথা শুনে ম্যাওর খুব চিন্তা হলো। এরকম আবার হয় নাকি? এখানে রাত ওখানে দিন– এ আবার কোন জগৎরে বাবা! এর মধ্যে খাটের ওপর ছোটকাকা খড়মড় করে নড়ে উঠল। তাই না শুনে ম্যাও তো ভয় পেয়ে গেল। ঝটপট করে মোবাইলটায় কয়েকটা থাবা মেরে আলো বন্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু না জানলে কী আর আলো বন্ধ করা যায়? আলো বন্ধ হচ্ছে না দেখে ম্যাও আরো ভয় পেয়ে গেল। মোবাইলটা মেঝেতে রেখে একবার তড়াক করে খাটের একপাশে যাচ্ছে আবার তড়াক করে মোবাইলের কাছে আসছে। রকম সকম দেখে জ্যাক ভাবল কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। তাই সে লাইন কেটে দিল। ছোটকাকা যেই দরজা খুলে বাইরে গেছে, অমনি ম্যাও পাঁজাকোলা করে মোবাইলটা বালিশের পাশে রেখে খাটের ওপরে এসে খুব ভালো মানুষটির মতো বসে থাকল।

কিন্তু ম্যাও ঘুমোতে পারছে না। তার খালি জ্যাকের কথা মনে পড়ছে। আর খালি চিন্তা হচ্ছে কেন ওখানে এখন দিন। এই না চিন্তা করতে করতে সে রাতে আর ম্যাও ঘুমোতে পারল না।

দিনের বেলায় ম্যাও বেশ গম্ভীর হয়ে থাকল। তার এখন বিদেশি বন্ধু, রাত আর দিন নিয়ে নতুন জিনিস শেখা হয়েছে। একটু দেমাক বেড়ে গেছে। পাশের বন্ধুদের সে পাত্তাই দিচ্ছে না। পাশের বাড়ির মারধোর খাওয়া 'পালাও পালাও' চেহারার বিড়ালটা একটু ভাব জমাতে এসেছিল। ম্যাও তাকে তেড়ে বের করে দিল।

পরের রাতে ম্যাও একই ভাবে মোবাইলটা নিয়ে বসল। জ্যাক স্ক্রিনে হাজির। জ্যাক বলল, 'বন্ধু তোমার জামা-প্যান্ট কই?' জামা প্যান্টের কথা শুনে ম্যাও আমতা আমতা করতে লাগল। জামা-প্যান্ট তো সে জীবনেও পরেনি। জ্যাক বলল, 'এখানকার মানুষেরা খুব ভালো, আমাকে জামা প্যান্ট দেয়। একটু সর্দি লাগলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।'

এসব শুনে ম্যাও আশ্চর্য হলো। ঝিনাদের ওপর রাগও হলো। কেন এরা জামা-প্যান্ট দেয় না তাই। এভাবে জ্যাকের সাথে প্রতিরাতে কথা বলতে বলতে তাদের মধ্যে খুব ভাব জমে উঠল। ম্যাও নতুন নতুন জিনিস জানে আর খালি চিন্তা করে। আসলে হয়েছে কী, এসব কথা তো সে আগে কখনও শোনেনি আর দেখেওনি। তাই চিন্তা করে করে সে কিছু মেলাতেও পারছে না।

তাই কিছুটা গম্ভীর ও একা একা হয়ে গেছে। প্রায় মাসতিনেক পরে একরাতে জ্যাক খুব কাঁদছে আর বলছে, 'বন্ধু আজ মনে হয় তোমার সাথে আমার শেষ দেখা। কাল এরা আমাকে চিড়িয়াখানায় দেবে।' চিড়িয়াখানার কথা ম্যাও কোনোদিন শোনেনি। তাই সে ভাবল চিড়িয়াখানা আবার কী জিনিস। সে বলল, 'চিড়িয়াখানা কী বন্ধু?'

জ্যাক বলল, 'সেখানে জীবজন্তু রাখা হয়, টিকেট কেটে লোকজন দেখতে আসে। সেখান থেকে জীবজন্তু কোনোদিন ছাড়া পায় না।' এ কথা শুনে ম্যাওর খুব খারাপ লাগল। নরওয়ের মানুষেরা এত খারাপ! তার মনে হচ্ছিল এখনি সেখানকার মানুষদের কামড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু একা একা তা তো সম্ভব না। তাই সে দল জোটাতে গেল। তবে তার এসব কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। কারণ সবাইতো ম্যাও'র মতো অতকিছু জানে না। শেষমেশ আমতলায় দল পাকাতে গিয়ে কয়েকটা কুকুরের তাড়া খেয়ে প্রাণ একেবারে যায় যায় অবস্থা! তাড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য দৌড়াতে গিয়ে বাঁশের বেড়ার ওপর দড়াম করে ধাক্কা খেল। আর চোখে কুঞ্চির খোঁচা খেয়ে 'ম্যাও ম্যাও' করতে করতে দিগ্বিদিক চরকির মতো ছুটতে লাগল। শেষে ঝিনার ছোটকাকা এসে রক্ষে করে। কুঞ্চির খোঁচা খেয়ে ম্যাও'র একটা চোখ বেশ ফুলে উঠেছে। তার একবার মনে হলো যদি নরওয়েতে থাকতে পারত তাহলে মানুষেরা চোখের ডাক্তার দেখাত, কিন্তু পরক্ষণেই সেই ভয়ানক চিড়িয়াখানার কথা মনে পড়ল।

ভূতের শহর দেখা

সে অনেক দিন আগের কথা। তখন পৃথিবীতে এত মানুষ ছিল না। তবে নানা প্রজাতির গাছপালা ও পশুপাখি ছিল। তখন শহর ছিল কম, গ্রাম ছিল বেশি। গোডাউনের ব্যবহার, চুরি-চাপটা থেকে রেহাই, লেখাপড়া ও চাকরি-বাকরির জন্য তখন মানুষ শহরে থাকত। অবশ্য বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে থাকত। তখন শহর মানে কয়েকটা ইটের রাস্তা, কতগুলো বিদ্যুতের খুঁটি। পাকা কয়েকটা অফিস ঘর আর তার পাশে আধাপাকা হোটেল। শহুরে মানুষজন ফুল প্যান্ট জামা পরে ফিটফাট হয়ে থাকত।

তা এরকম একটা সময়ে কালিগঞ্জ নামে এক মফস্বল শহর ছিল। কয়েকটি দরকারি অফিসের জন্য এটা শহর হয়েছে। সেখান থেকে বেশ দূরে এক গ্রামের প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়ে তিন ভূত থাকত। তাদের একজনের নাম ন্যাদা, একজনের নাম হাদা আর আরেকজনের নাম গদা। ন্যাদার খুব ইচ্ছে হলো শহরটি দেখতে যাবে। মানে একটু বেরিয়ে আসবে। সেই আনন্দে সে মনে মনে খুব হাসছে। মাঝে মাঝে হাসি চেপে রাখতে পারছে না। মুখ দিয়ে বেয়াড়া সুরে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই বেয়াড়া হাসির চোটে বক, কাক সব ত্রাহি ত্রাহি করে ছুটে পালাচ্ছে। তবু হাদা বলল, ‘কী হয়েছে ন্যাদা, এমন মিষ্টি সুরে হাসছিস যে! মতলবটা কী তোর?’ ন্যাদা হচ্ছে তিন ভূতের মধ্যে

সবচেয়ে ছোট। একটা আস্ত নারকেল গাছের ওপর আরেকটা আস্ত নারকেল গাছ তুলে দিলে যে রকম লম্বা হয়, ন্যাদা জন্মিয়েই সেই রকম লম্বা। তবু সে নাকি ছোট! তাই তার দাদির দাদির দাদি নাম রেখেছে ন্যাদা। হাদার কথা শুনে ন্যাদা বলল, 'সে কথা বলা যাবে না হাদা ভাই! আমি এক জায়গায় বেড়াতে যাব।' তাই শুনে হাদা বলল, 'বলা যাবে না মানে! দাঁড়া! এমন কাতুকুতু দেব যে তুই...' এই বলে হাদা ন্যাদার পেটে কাতুকুতু দেয়া শুরু করল। আর তাতে ন্যাদা 'খ্যাঁক খ্যাঁক' করে হাসতে হাসতে পেট কুঁকরে ফেলল। জাপটাজাপটি জড়াজড়ি করতে লাগল। এই করতে করতে বাঁশঝাড়ের ওপর থেকে দুই আস্ত ভূত ঝপাস করে নিচে পুকুরে এসে পড়ল। আর তাতে পুকুরের পানি এমন ছিটকে উঠল যে, একেবারে আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকল।

সেই ছিটকে ওঠা পানির সাথে কতগুলো চিংড়ি মাছও ওপরে উঠতে লাগল। তারা ভাবল, বারে! অসময়ে নাগরদোলা এলো কোত্থেকে! তারপর আধমাইল দূরে এক রাখালের মাথায় এসে পড়ল। সে বেচারি এক মনে খেলা করছিল। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই শুকনো ডাঙায় চিংড়ি মাছ মাথায় পড়তে, সে তো ভয়ে হাউ মাউ করে 'চিংড়ি ভূত! চিংড়ি ভূত!' বলতে বলতে গরু টরু ফেলে দে ছুট। এদিকে সেই পুকুরে ন্যাদা হাসি চাপতে চাপতে বলল, 'বলছি! বলছি! হি হি বলছি! চল আগে ওপরে উঠি।'

তারপর শহরে বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনে-টুনে তিন ভূত খুব আনন্দ করতে লাগল। একবার ভাবো তো! এই তিন ভূত যদি লোকালয়ে যায়, তবে কী অবস্থা হবে? তোমাদের মতো বাচ্চারা শুধু না, বুড়ো-হাবড়া-জোয়ানরা পর্যন্ত ভয়ে হার্টফেল করবে। পরের দিন খবরের কাগজে লেখা বের হবে, আর পুলিশেরা গুলি করতে এসে

এমন হাঁ করে থাকবে যে সে 'হাঁ' বোধহয় আজও বুজবে না। কিন্তু ভূতেদের একটা সুবিধে আছে। তারা ইচ্ছে করলেই রূপ ধরতে পারে। এই ধরো, যদি ভূত মনে করে ভেড়া হবে তা ভেড়া হতে পারবে। যদি মনে করে গরু হবে তা গরু হতে পারবে। তা ন্যাদা, হাদা আর গদা ভাবল যে, তারা ভেড়ার রূপ ধরে শহর ঘুরে বেড়াবে।

ভূতেরা তো শহরের হাবভাব বোঝে না। তারা ভাবল ভেড়াই ভালো। যেমন ভাবা তেমন কাজ। তিন ভূত শহরের কাছে এসে টুপ করে ভেড়ার রূপ ধরল। তারপর শহরের পাকা রাস্তায় তিন ভেড়া হাঁটতে লাগল। রাস্তার পাশে অনেক ঘাস আছে। সেদিকে তাদের লক্ষ্য নেই। ঘাড় মাথা কাঁত করে শুধু বিল্ডিং দেখছে। ফালুক ফুলুক করছে। এমন সময় স্কুল ছুটি হয়েছে। কিছু ছেলেপুলে এদিকে আসছিল। তারা শহরের রাস্তায় ভেড়া দেখে খুব আশ্চর্য হলো। এর মধ্যে একটা ছেলে করেছে কী, কিছু ইটের খোয়া কুড়িয়ে নিয়ে ঝুমাঝুম ভেড়াগুলোর গায়ে ছুড়তে লাগল। আর যাবে কোথায়! ধপাস ধপাস করে ইটের খোয়া এসে পড়তে লাগল ন্যাদা, হাদা আর গদার গায়ে। বেড়ানোর শুরুতেই হঠাৎ এমন ইট-পাটকেল খাওয়ায় ভীষণ আশ্চর্য হলো ভূত তিনটি। তারা বুঝতে পারছিল না কোথায় গণ্ডগোল। এরমধ্যে সব ছেলেরা ইট-পাটকেল ছুড়তে লাগল। তারা খেলা পেয়েছে। কিন্তু তিন ভূতের অবস্থা কাহিল। তারা মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছে না। নিজেদের দিকে শুধু তাকাতাকি করছে। এমন সময় বড় একটা ইটের টুকরো গদা ভেড়ার চোখে এসে চটাং করে লেগেছে। আর তাতে গদা হাউমাউ করে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু হাদা ভেড়া তক্ষুনি বুঝে উঠে এক লাফ মেরে গদার ওপরে গিয়ে পড়ল। আর ফিস ফিস করে বলল, 'খবরদার চেঁচাবি না, তাহলে

সব টের পেয়ে যাবে, সবে বেড়ান শুরু হয়েছে।' কাঁদো কাঁদো হয়ে গদা ভূত বলল, 'চোখে মারছে তো! চলো না, চলে যাই, শহর দেখা না হয় থাক, পই পই করে বললাম রাতে এসে দেখে যাব, তা তোমরা শুনলে না।' ন্যাদা এগিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, 'আরে রাতে পুলিশ থাকে, যদি গুলি করে দেয়!'

এরমধ্যে কয়েকজন বড় বড় লোক এদিকে আসছে। তারা ভেড়া দেখে বলল, 'আরে এখানে ভেড়া এলো কী করে?' একজন বলল, 'সব কটাকে ধর, আজ কেটে খাব।' এই না শুনে ভূত ভেড়াগুলো ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ওরে বাবাগো! মাগো! বলে তারা পালাতে গেল। আর যখন খুব ভয় বা রাগ হয় তখন ভূতেদের আসল চেহারা বেরিয়ে আসে। তা তাদেরও তাই হয়েছে। মাথার দিকটা ভূতের মতো আর নিচের দিকটা ভেড়ার মতো। চিকন চারটা পায়ের ওপর মস্ত একটা ভূত, তাদের ইটের ঘা-খাওয়া বেজার মুখ আরও যেন বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। এই রকম সাংঘাতিক বিদঘুটে তিন মূর্তি দেখে তিনটি ছেলে সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। বাকিগুলো রেল গাড়ির মতো ছুটতে লাগল, আর বড় লোকগুলো হাঁপাতে হাঁপাতে এমন ছুট দিল যে তাদের ফুলপ্যান্ট খুলে যাওয়ার অবস্থা। আর যে লোকটা বলেছিল 'কেটে খাব' তার তো কাঁপুনি ধরেছে এমন যে কাঁপার চোটে সে ছুটতে পারছিল না। তার শুধু মনে হচ্ছিল, 'এই বুঝি ধরে ফেলল!'

এদিকে ভূত তিনটে ভূমি অফিসের বিল্ডিং-এর পাশে লুকাল। অজ্ঞান হওয়া তিনটি ছেলে তেমনি পড়ে রয়েছে। তাই না দেখে ন্যাদার একটু বড় মানুষি করার ইচ্ছা হলো। তাই তাদের একজনের নাকে ন্যাদা একটা আঙুল ঠেকিয়ে আদর করতে গেল। তাতে যে ঝাঁকুনি হলো, তাতে ছেলেটির জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলে ন্যাদা ভূতকে দেখে

সে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। তাই দেখে ন্যাদা থতমত খেয়ে ফিরে এলো।

হাদা ভূত বলল, 'বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি, আমরা যে ভেড়ার রূপ ধরেছিলাম, ওই ভেড়ার মধ্যে গণ্ডগোল আছে। এবার মানুষের রূপ ধরতে হবে, তাহলে আর সমস্যা হবে না।' সাথে সাথে গদা ভূত বলে উঠল, 'তোমার কী লজ্জা-শরম কিচ্ছু নেই হাদা ভাই? মানুষের রূপ ধরবে তা জামা প্যান্ট কোথায় পাবে? আমরা ন্যাংটা হয়ে থাকব নাকি?' ন্যাদা হেসে বলল, 'জামা প্যান্ট লাগবে? কটা লাগবে? দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি।' এই বলে ন্যাদা তুড়ুক করে চড়ুই পাখির রূপ ধরে এক দর্জির দোকানে ঢুকে পড়ল। দর্জির সাথে তখন এক খদ্দের খুব গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিয়েছে। তার একটা জামা নাকি খুব ছোট করে ফেলেছে দর্জি। দর্জি হাউমাউ করে কেঁদে-কেটে মাফ চাচ্ছে কিন্তু খদ্দের কিছুতেই শুনছে না। সে টাকা ফেরত চাচ্ছে। ন্যাদা আর চড়ুই বেশে বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। সে একটি ছিট রাখার আড়ার ওপর থেকে নিজের ভূত রূপে ফিরে মেঝেতে ঢপাস করে নামল। ঘরের মধ্যে হঠাৎ জাম্বু মূর্তির ভূত দেখে দর্জি তো চোখ কপালে তুলে চিৎপটাং।

আর সেই খদ্দের। যে এতক্ষণ ধরে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। সে ঘাড় ফিরিয়ে ভূত দেখে ভয়ে হাঁ-করে পালাতে গিয়ে কাপড় চোপড়ের আড়ার সাথে ঘা খেয়ে কপাল টপাল কেটে হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় উঠেছে। এরমধ্যে ন্যাদা তাড়াতাড়ি কয়েকটা জামা প্যান্ট নিয়ে কুকুরের রূপ ধরে পালিয়েছে। শব্দ-টব্দ শুনে আশপাশের দোকানদার সব ছুটে এসেছে। তারা দর্জির দোকানে গিয়ে দেখল, দর্জি মরার মতো পড়ে আছে। তাই না দেখে কয়েকজন দৌড়ে এসে হামাগুড়ি দেওয়া খদ্দেরকে খপ করে ধরে ফেলল। বলল, 'তুই বেটা

দর্জিকে মেরে পালাচ্ছিস!' এই বলে কিল-চড়-লাথি-থাপ্পড় যে যার মতো খদ্দেরকে মারতে শুরু করল। খদ্দের বেচারা মারের মধ্যে দিশেহারা হয়ে আসল ঘটনাটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মার মার করে এমন লাথি কিল ঘুষি খদ্দেরের পিঠে পড়তে লাগল যে ওর চৌদ্দগুষ্টি একসাথে এমন মার কখনো খায়নি। মারের চোটে আধমরা হয়ে খদ্দের মনে মনে বলল, 'আর জামা বানাতে দেব না, দরকার হলে খালি গায়ে থাকব, কিন্তু জামা বানাতে আর আসব না।'

ওদিকে হয়েছে কী, চুরি করা জামা প্যান্ট। মাপ ঠিক নেই, তার ওপর একটা আবার মেয়েদের। তা ভূতেরা তো অতসব বোঝে না। যা পেয়েছে তাই পরে নিল। কোনোটা কোমরে হচ্ছে না, কোনোটা আবার হাঁটু পর্যন্ত পড়েছে। সে যে কী বিশ্রী দেখাচ্ছে! না দেখলে বোঝা যাবে না। হাদাটার এসব পরে থাকতে ভালো লাগছে না। তার বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু কী আর করা! ভূত হয়ে দিনের বেলা শহর দেখতে এসেছে। একটু ঝামেলা তো সহ্য করতেই হবে। তা বেখাপ্পা পোশাক পরে মানুষের রূপ ধরে তিন ভূত চলল। এবার ছেলেপুলে তাদের এইসব পোশাকে দেখে খুব হাসতে লাগল। মনে করল তিন পাগল কোথা থেকে এসেছে। চলতে চলতে তারা এক হোটেলের সামনে এসে হাজির। দেখল হোটেলের ভেতরে সবাই খাচ্ছে। তাদের খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে হবে। হোটেলের মালিক একেবারে হোটেলের সামনে টেবিল নিয়ে বসে ছিল। এই কিম্ভূত তিনটেকে দেখে তার একবার খুব রাগ হলো। কিন্তু খদ্দের তো হতে পারে, তাই ঝেঁটিয়ে দিল না। ভাবল, সার্কাসের জোকার-টোকার হবে। ন্যাদা, হাদা আর গদা গটগট করে হোটেলের ভেতরে ঢুকে পড়ল। গদার খুব খিদে পেয়েছিল। কিন্তু কোথায় বসতে হবে

সে জানে না। খিদের চোটে তাড়াতাড়ি টেবিলের উপরে বসতে গেল, আর ন্যাদা তক্ষুনি ধাক্কা মেরে ঠেলে দিল। ফিসফিস করে বলল, 'দেখতে পাচ্ছিস নে, সব চেয়ারে বসে আছে।' হাদা বলল, 'আমার তো ভীষণ গরম লাগছে, এসব খুলে ফেলব?' ন্যাদা চেঁচাতে গেল, সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'না না, খবরদার সব টের পেয়ে যাবে, ইট-পাটকেলের কথা মনে নেই?' হাদা তাড়াতাড়ি বলল, 'সে কী আর ভুলব কোনোদিন!' তারা এক টেবিলে তিনজন বসে পড়ল। ভূতেরা তো খাবার আগে হাতটাত ধুতে হয় তা জানে না। তাই হাতটাত না ধুয়ে চুপচাপ বসে থাকল। এরমধ্যে একটা ছোকরা এসে বলল, 'কী খাবেন?' ন্যাদা মনে মনে বলল, 'তোকে খেলে ভালো হতো' কিন্তু এখন তারা মানুষ, তাই বলতে পারল না। বলল, 'যা আছে নিয়ে এসো।' ছোকরাটা তিন প্লেট ভাত, তিন বাটিতে এক টুকরো করে মাছ আর ঝোল নিয়ে এলো। ভূতগুলো জানে না কোনটা দিয়ে কী খেতে হয়। প্লেট থেকে ভাতগুলো তুলে মাছের ঝোলের বাটিতে নিয়ে দুই তিন গ্রাসে শেষ করে ফেলল। ভূতের খাবার বলে কথা! ওটুকুতে কী আর হয়! মানুষ সাজা ভূতগুলো বলছে, 'আরও আনো' আর হোটেলের ছোকরাটা নিয়ে আসছে। কিন্তু আনতে না আনতেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে হোটেলের মালিক ভাবছে, 'খদ্দের আজ পাওয়া গেছে, একবার রান্না করে দুদিনেও শেষ করা যায় না। আর আজ এক বেলাতেই সব বিক্রি হয়ে যাবে।' তার তো বেশ আনন্দ হচ্ছে। সে শুধু বিল কষে কষে রাখছে। এরপর যখন সব ফুরিয়ে গেছে, তখন তারা খাওয়া থামাল। এবার বিল দেওয়ার পালা। কিন্তু ভূতেরা টাকা পাবে কোথায়? তাই হোটেল মালিক যখন বলল 'একশ পাঁচ টাকা বিল হয়েছে, দেন' তখন তারা একে অপরের দিকে মুখ চাওয়া শুরু

করল। রকম-সকম দেখে মালিক ভাবল 'এদের ভাব তো ভালো না.। তাই একটু জোরে বলে উঠল, 'কই টাকা দেন।' ন্যাদা একটু ভয় পেয়ে বলল, 'ভাই, এখানে খেলে টাকা দিতে হয় তা তো আমরা জানিনে। তা আমরা একটু পরেই এসে দিয়ে যাচ্ছি।' হোটেল মালিক রেগে মেগে বলে উঠল, 'মানে? হোটেলে খেয়ে টাকা দিতে হয় তা আপনারা জানেন না! কোন জমিদারের পুত্তুর আপনারা? টাকা ফেলে কথা বল। এই শ্যাম, দড়ি আন, এদের বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দে।'

পুলিশের কথা শুনে ভূত তিনটার খুব ভয় হতে লাগল। তা আর কী করা। শেষমেশ পুলিশ এসে তিনটেকে ধরে নিয়ে থানায় গেল। থানায় গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি কোথায়?' গদা ফট করে বলল, 'বাঁশঝাড়ে।' পুলিশটা বলল, 'কী! রসিকতা করছ!' বলে আচ্ছা এক বাড়ি কষল গদার পিঠে। তাতে গদা কোঁক করে উঠে চুপ হয়ে গেল। পুলিশটা খাতায় লেখা বন্ধ করে আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি কোথায়?' এবার হাদা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, 'আপনার যেখানে সুবিধে হয় সে রকম একটা জায়গার নাম লিখুন।' পুলিশটা ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'পুলিশের সাথে ইয়ার্কি!' বলেই হাদার কানপাটিতে দিল এক থাপ্পড়। এক থাপ্পড়ে হাদার কান তালা লেগে গেল, শুধু বোঁ বোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এসব দেখে ন্যাদাও ভয় পেয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমাদের কোনো বাড়ি নেই।' এ কথা শুনে পুলিশ বলল, 'আচ্ছা, তাহলে খুব ভালো হবে, জেলের মধ্যে থাক, ওটাই তোদের বাড়ি' বলে দড়ি দিয়ে থানার একপাশে বেঁধে রেখে দিল।

কিন্তু বন্দি থাকতে তারা আসেনি। তাদের মনে হলো– আর নয়, এ জায়গা তাদের নয়, এবার বাঁশঝাড়ের কথা খুব মনে পড়ছে। তাই

সে রাতে তারা পিঁপড়ের রূপ ধরে দড়ি ফসকে বেরিয়ে পড়ল। থানার বারান্দা দিয়ে পিঁপড়ে হয়ে ছুটছিল, এমন সময় ডিউটি অফিসার দ্রুত বাইরে যাচ্ছিল। তার পায়ের নিচে ভূত পিঁপড়ে তিনটে পড়তেই বাবাগো মাগো বলে ভূতেরা আসল চেহারার হয়ে গেল। তাই দেখে থানার ডিউটি অফিসার ভয়ে অস্থির। ভাগ্যিস তার হাতে তখন বন্দুক ছিল না। সে 'ওরে বাপরে!' বলে চিৎকার করে টপ করে এক ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা আটকে লুকাল। সেই ফাঁকে ভূত তিনটে সেখান থেকে ছুট দিল আর একেবারে তাদের জায়গায় মানে সেই বাঁশঝাড়ে এসে থামল। এখানে কোনো চিন্তা নেই, কোনো রূপ ধরার ঝামেলা নেই।

এরপর ভূতেরা আর কখনো শহরে বেড়াতে যাওয়ার কথা মনেও করত না।

গজঘট

একদিন এক দুর্বল রাজ্যে এক সবল রাজা আক্রমণ করেছে। ভয়ানক সে আক্রমণ। আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেনে করে বোমা ফেলা হচ্ছে। দিগ্বিদিক কানফাটানো শব্দ। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে সে রাজ্য। মানুষজন, পশুপাখি, কলকারখানা, ঘরবাড়ি সব আগুনে পুড়ছে।

সে রাজ্যের রাজপ্রাসাদে থাকে এক চড়ুইপাখি। দেখতে দেখতে সেই প্রাসাদে পড়েছে এক বোমা। অমনি চারিদিকে প্রচণ্ড শব্দে আগুন জ্বলে উঠল। রাজার একটা ছোট্ট ছেলে ভয়ে বারান্দার এক কোণে বসে বসে কাঁদছে। তার সমস্ত শরীর বোমার ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। চড়ুই ভাবল কিছু একটা করতে হবে। সে তাড়াতাড়ি সেই ছেলেটিকে বলল, 'ভয় পেয়ো না, সাবধানে থেকো, আমি দেখি কিছু করা যায় কিনা।' একথা বলে চড়ুইপাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে সবল রাজার রাজ্যে গেল।

সেখানে বনে থাকে মহিষ। চড়ুই মহিষকে বলল, 'আপনার গায়ে তো অনেক শক্তি! আপনাদের রাজাকে গুঁতিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দিন।' মহিষ বলল, 'সে সাধ্যি আমার নেই, তুমি বাঘের কাছে যাও।' চড়ুই বাঘের কাছে গেল। বাঘ বলল, 'এ রাজ্যের রাজা বড় সাংঘাতিক! তাকে কিছু বলার সাধ্যি এ রাজ্যে কারো নেই, তুমি গজঘটের কাছে

যাও।'

চড়ুই গজঘটের কথা কখনো শোনেনি, সে জিজ্ঞেস করল, 'গজঘট কে? কোথায় থাকে?'

বাঘ বলল, 'গজঘটের ভালো নাম ক্রিস্টিয়ানো ওকিহো হোহো। থাকেন পাশের রাজ্যে শৈলেন পাহাড়ের পাশে কাঁটাবনে। আমেরিকার এক বিজ্ঞানী তাকে তৈরি করেছিল। পরে সেই বিজ্ঞানীকেই সে মেরে ফেলেছে। বাংলাদেশ না কোন দেশের জাতির পিতাকে ওই বিজ্ঞানী অসম্মান করেছিল, গজঘটের তা সহ্য হয়নি। অবশ্য বিজ্ঞানী প্রথমে যেমন বানিয়েছিল, গজঘট নিজের সুবিধার জন্য তার চেহারার অনেকখানি পরিবর্তন করেছে।'

এসব শুনে চড়ুইয়ের একটু ভয় লাগল, সে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ধরে খাবে না তো?' বাঘ জানাল গজঘট পৃথিবীর কোনো খাদ্য খায় না। সে প্রতিরাতে চাঁদে যায়, চাঁদের যে পিঠ পৃথিবী থেকে কখনো দেখা যায় না, সেখানে নাকি তার খাদ্য আছে, সূর্যের রোদ থেকে তৈরি হয়।

চড়ুইপাখি দুইদিন দুইরাত কিছুটা উড়ে কিছুটা জিরিয়ে সেই শৈলেন পাহাড়ে পৌঁছল। তারপর কাঁটাবন খুঁজে সেই গজঘটের দেখা পেল। গজঘট তখন একটা পাইন গাছের সাথে গল্প করছিল।

গজঘটের চেহারা সত্যিই গজঘটের মতো। একহাত লম্বা হবে। মুখটা বড় বেয়াড়া। নাকের জায়গায় নাক নেই, সেখানে শুধু দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে। নাক রয়েছে থুতনিতে, কথা বললে নাক নড়ে, কপালের দুইপাশে বড় বড় দুই চোখ। মোট চোখ চারটে। মাথায় চুলগুলো হিজিবিজি, খাড়া খাড়া। কান দুটো কদম ফুলের পাতার মতো। হাত আছে, তবে দুটি বড় বড় ডানার নিচে ঢেকে থাকে। ডানা দুটো একেবারে কাঁধের কাছ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত

ঝোলা। কোমরের কাছে কী একটা ছালের মতো জড়ানো, পা দুটো সরু, স্টিলের মতো টনটন করে। বুকের ঠিক মাঝখানে বন্দুকের নলের মতো একটা ছোট শুঁড় সোজা হয়ে আছে। সমস্ত গা-হাত-পায়ে খাঁজ খাঁজ। গজঘটের সুবিধা এই যে সে মশার মতো ছোট হতে পারে আবার কলসির মতো বড় হতে পারে। চড়ুই ভয়ে ভয়ে বলল, 'গজঘট সাহেব, আমাদের খুব বিপদ, আপনি আমাদের বাঁচান, এক দুষ্ট রাজা অকারণে আমাদের নিরীহ রাজার রাজ্যে আক্রমণ করেছে। শুধু বড় বড় বোমা ফেলছে, অকালে সব মরে যাচ্ছে।'

চড়ুইয়ের কথা শুনে গজঘটের শরীর রাগে ফুলে উঠল। সে যন্ত্রের মতো শব্দ করে বলল, 'তুমি আমার কাঁধে শক্ত করে বসো।' তারপর সাঁই করে নিমেষেই উড়ে গিয়ে সেই দুষ্ট রাজার রাজ্যে ঢুকল। চড়ুইকে একটা আমগাছের ডালে বসে থাকতে বলে গজঘট তাড়াতাড়ি নিজের গা-হাত-পা গুটিয়ে একটা মশার সাইজের মতো হয়ে গেল। তারপর দুষ্ট রাজার ঘরে ঢুকল।

রাজা তখন টেলিভিশনে যুদ্ধের খবর দেখছিল আর আলু ভাজা খাচ্ছিল। রাজা মহা আনন্দে হাঁ করে টেলিভিশনে একটা বোমা পড়ার ছবি যখন দেখছিল। ঠিক সেই সময়ে গজঘট রাজার ডান চোখে ঢুকে দিল এক কামড়। আর সাথে সাথে রাজা চোখ বন্ধ করে তিন হাত লাফিয়ে 'গেলাম রে! গেলাম রে! রানি! মন্ত্রী!' বলতে বলতে ছোটাছুটি করতে লাগল। চোখ বন্ধ থাকায় রাজা কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। ছটফট করতে গিয়ে রাজা প্রথমে টেলিভিশনে ঘা খেল, টেলিভিশন দড়াম করে মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল। রাজা ছুটে বাইরে বেরুতে গিয়ে দরজার পাশের দেয়ালে ঘা খেয়ে নাক-মুখ ফাটিয়ে চিৎপটাং হয়ে মেঝেতে পড়ে 'গেলাম রে! চোখে বোমা

মেরেছে রে! ' বলতে বলতে হাত-পা ছুড়তে লাগল। তাই শুনে রানি মন্ত্রীরা সব ছুটে এলো। রাজার ঘরের দেয়ালের ওপর থাকত এক ইঁদুর। গজঘট রাজার চোখ থেকে বেরিয়ে সেই দেয়ালের ওপরের ইঁদুরটিকে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই!, যুদ্ধমন্ত্রী কোনটা রে?' ইঁদুর হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ভারি দুষ্ট, ওই যে কালো কোট পরে রানির পাশে দাঁড়িয়ে আছে।' গজঘট ফুঁ দিয়ে ইঁদুরটাকে দেয়ালের ওপর থেকে ফেলে দিল আর মেঝেতে পড়ে ইঁদুর ভয়ে দৌড়াতে গিয়ে মহামন্ত্রীর কোটের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মহামন্ত্রী 'কী হয়েছে রাজা মহোদয় ' বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কোটের মধ্যে কী ঢুকেছে টের পেয়ে তিড়িং বিড়িং করে 'কীরে! কীরে!' বলে লাফাতে লাফাতে যুদ্ধমন্ত্রীর গায়ে দিল এক ঠেলা। আর যুদ্ধমন্ত্রী সেই ঠেলায় পড়ল গিয়ে রানির ওপর। রানি তখন 'ও মা!' বলে যুদ্ধমন্ত্রীর কান ধরে কষে মারল এক চাঁটি। সেই চাঁটি খেয়ে 'উহু' করে কানে হাত বুলাতে বুলাতে আর ঘুরতে ঘুরতে যুদ্ধমন্ত্রী দড়াম করে পড়ল শুয়ে থাকা রাজার ভুঁড়ির ওপর। আর বিশাল চাপ খেয়ে রাজা কঁকিয়ে উঠে যুদ্ধমন্ত্রীকে দড়াম করে মারল এক লাথি। লাথি খেয়ে যুদ্ধমন্ত্রী 'উহ মা!' করে উঠে 'শালা!' বলে মহামন্ত্রীর নাকে মারল এক ঘুষি। মহামন্ত্রী ইঁদুর বের করতে কোট খোলার জন্য অন্য ঘরে যাচ্ছিল। ঘুষি খেয়ে 'ক্যাঁক' করে উঠে সজোরে পড়ল রাজার ভুঁড়ির ওপর আর তাতে রাজার পেট পটাশ করে ফেটে রাজা মরে গেল। যুদ্ধ থেমে গেল। গজঘট তখন নিজের রূপে ফিরে দেয়ালের ওপর থেকে টুপ করে মেঝেতে নেমে পড়ল। আর গজঘটের বেজায় বিদঘুটে চেহারা দেখে রানি মন্ত্রী সব ভয়ে 'হাউমাউ' করে পালাতে গিয়ে চেয়ার-টেবিল-দেয়ালে ঘা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকল। গজঘট তখন মরা রাজার গালে কষে এক থাপ্পড় মেরে চলে গেল। পরে সে

রাজ্যের বিচার বিভাগ রাজাকে হত্যার দায়ে মহামন্ত্রীকে ফাঁসি আর যুদ্ধমন্ত্রী ও রানিকে যাবজ্জীবন সাজা দিল।

গজঘট চড়ুইকে তার রাজ্যে পৌঁছে দিল আর বলল, 'কোনো বিপদ হলে আমাকে আবার ডাকবে।'
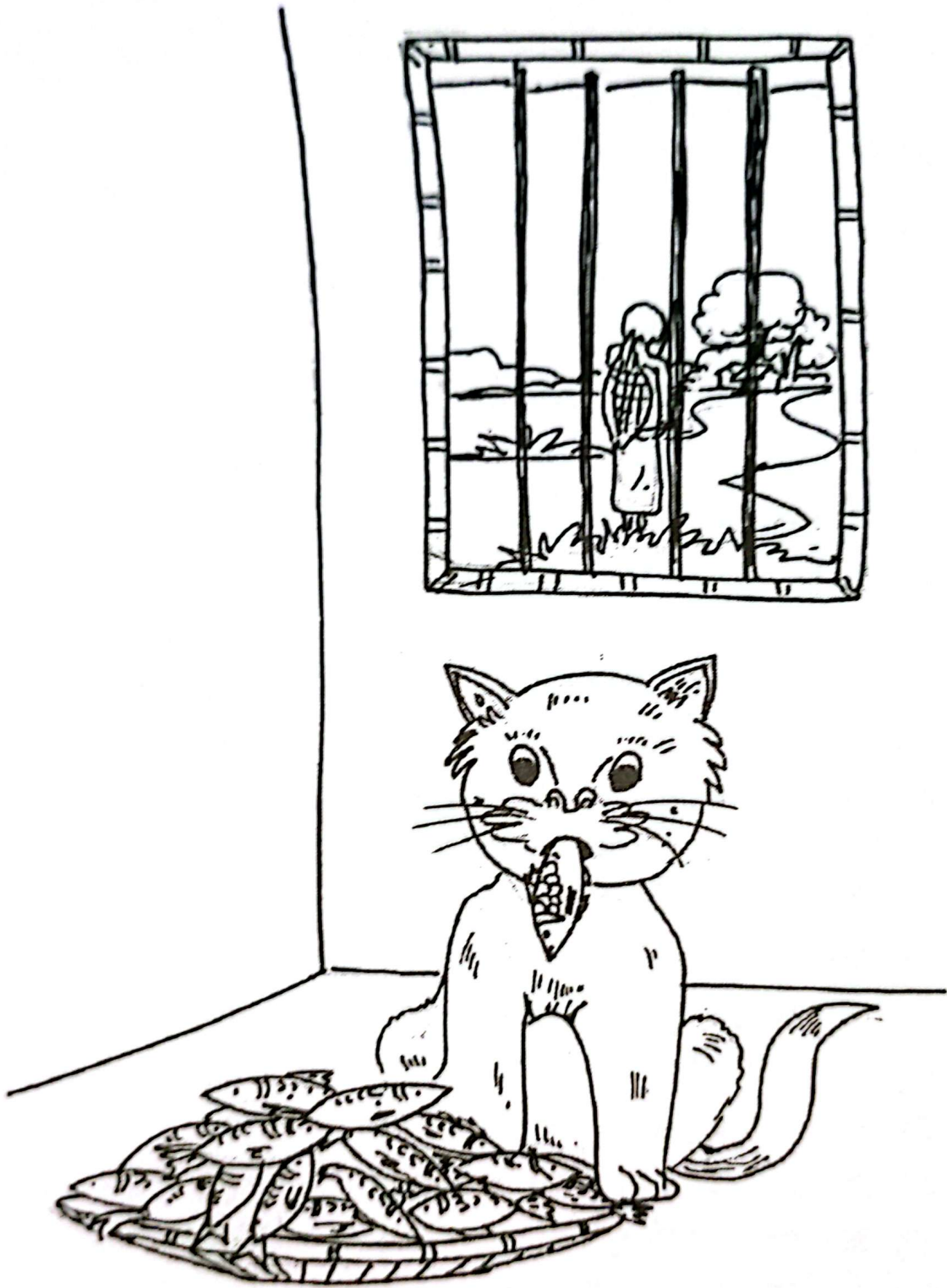
বনবিড়ালের শাস্তি

এক বনের ধারে বাস করত এক জেলে। সেই বনের পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে গিয়েছিল। জেলে সেই নদীতে মাছ ধরত, আর কিছু মাছ বাড়িতে খাওয়ার জন্য রেখে বাকিগুলো বাজারে বিক্রি করত।

জেলে যেই বাজারে মাছ বিক্রি করতে চলে যেত, সেই ফাঁকে এক বনবিড়াল জেলের ঘরে ঢুকে জেলের রেখে যাওয়া মাছগুলো খেয়ে যেত। জেলে বাড়ি ফিরে দেখত, কে তার সব মাছ খেয়ে গেছে। জেলে শুধু-ভাত খেত আর চোরের ওপর রাগ করত।

একদিন চোর ধরার জন্য জেলে মাছ বিক্রির নাম করে মিছিমিছি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর অন্যপথ দিয়ে বাড়ির পেছনে এসে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকল। কিন্তু বনবিড়ালটা ছিল খুব সেয়ানা। সে পাশের একটা কেওড়া গাছে থাকত। আর সেখান থেকে লুকিয়ে দেখতে পেল যে, জেলে বাজারে না গিয়ে তাকে ধরার জন্য লুকিয়ে ঘরের পেছনে গোলপাতার ঝোপে বসে আছে। তাই বনবিড়ালটা সেদিন আর মাছ চুরি করতে জেলের ঘরে ঢুকল না।

এদিকে চোর ধরতে না পেরে জেলের খুব চিন্তা হতে লাগল। আর শুধু-ভাত খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে যেতে লাগল। তাই একদিন বনবিবির মাজারে গিয়ে দুটাকার মানত করল।

মানত করে ফেরার সময় পথে বনবিড়ালের সাথে জেলের দেখা

হলো। বনবিড়াল জিজ্ঞেস করল, ও জেলে ভাই। কোথায় গিয়েছিলে? জেলে উত্তর দিল, আর বোলো না ভাই! কে যেন আমার মাছগুলো খেয়ে যায়, আমি ধরতে পারি না, তাই বনবিবির কাছে মানত করতে গিয়েছিলাম। বনবিড়াল তখন বলল, ও এই কথা, তোমার মাছগুলো বনবিবিই তো চুরি করে খেয়ে যায়। এক কাজ করো, তোমার বিক্রির মাছ থেকে কয়েকটা মাছ প্রতিদিন বনবিবির মাজারে দিয়ে এসো, দেখবে তখন বনবিবি আর তোমার ঘরের মাছ চুরি করবে না।

বোকা জেলে বনবিড়ালের কথামতো প্রতিদিন নিজের বিক্রির মাছ থেকে কয়েকটা মাছ বনবিবির মাজারে রেখে আসত। আর বনবিড়াল মনের সুখে সেই মাছগুলোও চুরি করে খেতে লাগল।

একদিন জেলে বনবিড়ালকে বলল, ভাই, তোমার কথামতো সব তো করলাম কিন্তু চুরি তো বন্ধ হলো না। বনবিড়াল বলল, দুঃখ কোরো না, তুমি যে বনবিবিকে মাছ খেতে দিচ্ছ। তিনি তা এখনো টের পাননি, টের পেলে আর ঘরের মাছ চুরি হবে না।

এদিকে হয়েছে কী! বনবিড়াল বনবিবির মাজারে জেলের রাখা মাছ খেতে এসে একদিন দেখল কোথাকার একটা বক এসে আগে থেকে সব মাছ খেয়ে বসে আছে। লোভী বনবিড়ালের তাতে খুব রাগ হলো। 'চোরের ওপর বাটপারি!' বলে সে রেগে মেগে বককে তাড়া করল। আর বকটা প্রাণভয়ে দৌড়ে সেই জেলের ঘরে পালাল। বনবিড়ালও বকটাকে ধরতে জেলের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এদিকে জেলে বাজার থেকে বাড়ি এসে দেখল তার ঘরের মধ্যে বক আর সেই বনবিড়াল খুব মারামারি করছে। জেলেকে দেখে বক দৌড়িয়ে জেলের কাছে এসে বলল, জেলে স্যার, জেলে স্যার, আমাকে বাঁচান, এই বনবিড়াল আপনাকে ধোঁকা দিয়ে আপনার সব

মাছ চুরি করে খায়। আপনি যে মাছ বনবিবিকে খেতে দেয়ার জন্য রেখে আসেন, তাও এই বনবিড়াল চুরি করে খায়। আমি ভাবলাম সব বনবিড়াল একা খাবে? তাই খিদের চোটে আজ ক'টা মাছ খেয়ে ফেলেছি আর অমনি বনবিড়ালটা আমাকে মারতে মারতে এখানে নিয়ে এসেছে।

এ কথা শুনে জেলে বনবিড়ালের সব ফন্দি বুঝে ফেলল। সে তখন ঝপ করে ঘরের দরজা আটকিয়ে খপ করে বনবিড়ালকে ধরে ফেলল। তারপর বনবিড়ালের নাক কেটে, কান কেটে, চুল কেটে বনের বাইরে বের করে দিল।

বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী। জন্ম ৩০ এপ্রিল ১৯৭৫, দক্ষিণ শ্রীপুর, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

পিতা : অসীম ভঞ্জ চৌধুরী। মাতা : রিতা ভঞ্জ চৌধুরী।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নয়ন অধ্যয়নে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে জনতা ব্যাংকে কর্মরত। সাহিত্যের সকল শাখায় লিখছেন।

শিশুকিশোরদের জন্য এটি তাঁর প্রথম বই।

Bhooter Sohor Dekha
by Bablu Bhanja Chowdhury

Price 140 Tk ❖ 6 $
Cover Design ❖ Nazmul Alam Masum
Babui ❖ Dhaka ❖ Bangladesh

ISBN 978-984-8025-17-8